গল্পের মজলিশ

এস. ওয়াজেদ আলী
বি.এ. (অক্সফোর্ড) বার-এট-ল

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩৮নং জনসন রোড, ঢাকা

১৩৫১

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ ব্যানার্জ্জী
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

উৎসর্গ

আমার মধ্যম পুত্র

আহমদ আলির

হাতে

"গল্পের মজলিশ"

দিলাম।

বাবা

বাদশা ও ফকির	১—	৬	পৃষ্ঠা
হার-জিত	৭—	১৮	”
আরব-নারীর আতিথেয়তা	১৯—	২৪	”
পিতার সন্ধানে	২৫—	৬৪	”
পেস্তার পায়েস	৬৫—	৭২	”
কবির আমানত	৭৩—	৭৮	”
খোদা রুজি দেনেওয়ালা	৭৯—	১০৫	”

লাঘমা ও ফকির

সে-কালের বাদশারা ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বের হতেন প্রজাদের অবস্থা জানবার জন্য, আর লোকজন তাঁদের বিষয় কি ধারণা পোষণ করে তা অবহিত হবার জন্য। শাম দেশের বাদশা মালিক শাহ, এই রকম একদিন নগরভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তিনি উপাসনার জন্য এক মসজীদে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, সেখানে দুইটি ফকির জড়সড় হয়ে ব'সে আছে। দারুণ শীতের দরুণ সারারাত তা'রা ঘুমুতে পারে নি। এক কোণে ব'সে পরস্পরের দুঃখের কথাই তা'রা বলছিল।

একজন ফকির একটু উত্তেজিত হয়ে বললে—"যাই বল ভাই, শেষ-বিচারের দিন ব'লে একটা কিছু আছে তো। তখন দেখা যাবে আমীর-ওমরাহ আর নবাব-বাদশাদের কি অবস্থা হয়। এই সব স্বার্থপর লোকেরা নিজেদের আমোদ-প্রমোদ নিয়েই মত্ত। গরীবদের জীবন যে কেমন ক'রে কাটছে তা দেখবার তাদের অবসর নেই। দেখ ভাই, আমি তোমায় খোদার নামে শপথ ক'রে বলছি, এইসব

বড়লোকেরা যদি স্বর্গে যায়, আমি তাহলে সেখানে যেতে অস্বীকার করব ; খোদা আমায় যতই সাধাসাধি করুন না

কেন। আমি বলব, 'হুজুর, বড়লোকদের পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ দিয়েছেন, এখানেও দিন। আপনি তো যা ইচ্ছা করতে

পারেন। এই গরীবকে কবরেই থাকতে দিন। অন্ততঃ এইটুকু মেহেরবাণী আমার ওপর করুন, আমাকে আর এই অনন্ত নিদ্রা থেকে জাগাবেন না।' তবে এমন ধারা যে হবে না তাও নিশ্চিত। খোদার তো বিচার ব'লে একটা জিনিস আছে। আজ যে দুঃখ আমরা পাচ্ছি, তার একটা প্রতিদান তো তাঁকে দিতে হবে। নিশ্চয় তিনি স্বর্গটাকে আমাদের জন্যই বরাদ্দ ক'রে রেখেছেন। সেখানে নবাব-বাদশারা কখনই ঢুকতে পাবে না। আর আমাদের কাছ থেকে যদি ঢোকবার অনুমতি চায়, সে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাদের কাছ থেকে এখানে কি এমন পেয়েছি যে, পরলোকে তাদের আবদার সহ্য করব? এই যে আমাদের বাদশা মালিক শা, সে যদি দেয়াল টপকে অলক্ষ্যে স্বর্গে ঢুকতে চেষ্টা করে, তাহলে জুতো মেরে তার মাথার মগজ বার ক'রে তবে ছাড়ব। আমি কিছু একটা যে সে লোক নই। ভয়ানক বদমেজাজী আমি।"

মালিক শাহ ফকিরের কথা শুনে আপন মনে হাসলেন, তারপর প্রাসাদে ফিরে গেলেন। ফকিরদের প্রাসাদে আনবার জন্য তিনি লোক পাঠালেন। বাদশার চোপদারদের আহ্বান শুনে তা'রা ভয়ে অধীর হয়ে উঠল। যে লোকটি বড় বড় কথা বলেছিল, সে তো আধমরার মতই হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে তা'রা প্রাসাদে উপস্থিত হ'ল। চোপদার তাদের বাদশার সকাশে উপস্থিত করল।

এদিকে বাদশা কিন্তু বিশেষ আদরের সঙ্গে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। সুন্দর আসনে তাদের বসতে দিলেন। তাদের

জন্য সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি উপস্থিত করা হ'ল। যত্নের সঙ্গে বাদশা তাদের খাওয়ালেন। তারপর, মূল্যবান পোষাকে

বিভূষিত ক'রে, তাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি ক'রে স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন।

ফকিরেরা বাদশার মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে বললে—"হে মহামহিম বাদশা! আমরা কি এমন ভাল কাজ করেছি যার জন্যে এভাবে আপনি আমাদের সম্মানিত করছেন?"

বাদশা হাসতে হাসতে বললেন—"আপনারা আমার বিষয় ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। আপনাদের সেই ভ্রান্তি দূর করবার জন্যই এই আয়োজন। আশা করি আপনারা এখন বুঝেছেন যে, দীনদুঃখীদের দুঃখকষ্টে আমার অন্তর অবিচলিত থাকে না। একটা অনুরোধ আমার রাখবেন। আমি যদি স্বর্গের উদ্যানে প্রবেশ লাভ করি, আপনারা তা নিয়ে খোদার সঙ্গে কলহ করবেন না; আর আমার মাথাটাকে সেখানে অক্ষতই ছেড়ে দেবেন।"

লজ্জাবনত শিরে বাদশার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে ফকিরদ্বয় প্রাসাদ থেকে বের হ'ল।

বনিসাদ-বংশের শেখ সালেকের নাম জানে না এমন লোক আরবের মরুদেশে কেউ ছিল না। যেমন গায়ের জোর, তেমনি তাঁর সাহস! যেমন ঐশ্বর্য্য, তেমনি উদারতা! যেমন ন্যায়-নিষ্ঠা, তেমনি তিতিক্ষা! আরবরা তাঁকে খুব মানত। শত্রুর আক্রমণে তাঁকেই তা'রা নেতা করত। সম্পদে-বিপদে সালেক ছিলেন তাদের সব।

মরু-আরবের সবচেয়ে বড় সম্পদ ঘোড়া। ঘোড়ার আদর সেখানে ছেলেমেয়ের মত। নিজের হাতে ঘোড়াকে খাওয়ান, তাকে কাছে নিয়ে শোয়া, কত রকমের পরিচর্য্যা—এক কথায় ঘোড়ার আদর-যত্নের সীমা ছিল না।

আরব-ঘোড়ার প্রভুভক্তিও তেমনি। প্রভুর ইচ্ছায় ঘোড়া আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে! মরু-আরবদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই আছে এবং আরবরা যুদ্ধ করে ঘোড়ায় চ'ড়ে। মরু-ঘোড়ার প্রাণও ঠিক মরু-আরবের ছাঁচে গড়া। শিক্ষার গুণে তার বুদ্ধি এমন যে, শত্রু-মিত্রের সম্পর্কও ঠিক বুঝতে পারে।

আরব-শেখদের সকলেরই একাধিক ঘোড়া থাকে,—বড় বড় শেখদের ঘোড়া থাকে শত-শত। শেখ সালেক ছিলেন মস্ত-বড় শেখ। তাঁর ঘোড়া ছিল প্রায় এক হাজার। কিন্তু তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন একটি সাদা ঘোড়াকে। এ ঘোড়ার জন্ম খুব উঁচু বংশে। এ ঘোড়ার নাম রুখ্‌শ্‌। রুখ্‌শের তুলনা ছিল না।

সালেকের এক বন্ধু ছিলেন মালেক—বনিহামের বংশের শেখ। দু'জনে খুব বন্ধুত্ব। দু'জনে একসঙ্গে শিকারে যেতেন,

তাঁবুতে ব'সে একসঙ্গে দাবা খেলতেন, আবার একসঙ্গে যুদ্ধ-অভিযানেও বেরুতেন।

মালেকের একদিন নজর পড়ল সালেকের প্রিয় ঘোড়া রুখ্‌শের ওপর। বন্ধুর কাছে আব্দার জানিয়ে বললেন—"এ ঘোড়াটি আমায় দিতে হবে।"

সালেক কোনমতেই রাজী হলেন না ; বললেন—"তুমি যা চাও, দিতে পারি বন্ধু, কিন্তু রুখ্‌শ্‌কে না।"

এই নিয়ে দু'জনে একটু মন-কষাকষি হ'ল। বন্ধুত্বের নির্ম্মল আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল।

একদিন মালেক এসে সালেককে বললেন—"এস দু'জনে কুস্তি করি। যে জিতবে, ও-ঘোড়া তার হবে।"

সালেক বললেন—"বেশ !"

বিভিন্ন কবিলার (গোত্রের) লোক লড়াই দেখতে এল। মালেকও দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু সালেক তাঁকে সহজেই ভূপাতিত করলেন। সালেকের কবিলার লোকজন আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। রুখ্‌শ্‌ সালেকেরই রয়ে গেল।

তারপর মালেক আর একদিন এসে সালেককে কৃত্রিম অসি-যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তাতেও সালেক রাজী হলেন এবং এবারও মালেককে তিনি অতি সহজে পরাজিত করলেন।

মালেক শেষে আবার একদিন সালেকের তাম্বুতে এসে বললেন—"দেখ দোস্ত, ও ঘোড়া না পেলে আমার চলবে না। আচ্ছা, যদি চালাকি ক'রে, প্রতারণা ক'রে, তোমার কাছ থেকে রুখ্‌শ্‌কে নিতে পারি, তাহলে ঘোড়া আমার হবে ?"

নিজের কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার ওপর সালেকের প্রচুর বিশ্বাস ছিল। হেসে তিনি বললেন—"বেশ, তাই হবে। কৌশল বা চালাকি ক'রে রুখ্‌শ্‌কে যদি নিতে পার, রুখ্‌শ্‌ তোমার হবে।"

"ও ঘোড়া না পেলে আমার চলবে না…"

মালেক বললেন—"নিতে পারার মানে? আমি যদি তোমার অনুমতি না নিয়েই রুখ্‌শ্‌কে চালিয়ে তোমার কাছ থেকে বিশ হাত দূরে নিয়ে যেতে পারি, তাহলেই সে আমার হবে?"

আত্মবিশ্বাসী সালেক বললেন—"তাই হবে।"

মালেক তাঁর তাম্বুতে ফিরে গেলেন। তারপর মাসের পর মাস কেটে যায়, মালেকের সঙ্গে সালেকের আর দেখা হয় না। সালেক ভাবেন, তাই তো, মালেক আসে না কেন? ঘোড়ার সম্বন্ধে খুব সতর্ক রইলেন। রুখ্‌শ্‌কে সর্ব্বদা চোখে-চোখে রাখেন, ফন্দি-ফিকির ক'রে মালেক যেন তাকে হস্তগত করতে না পারে!

কি কাজে সালেকের একদিন বাগদাদ যাবার দরকার হ'ল। রুখ্‌শের পিঠে চড়েই তিনি যাত্রা করলেন। কি জানি, তিনি চ'লে গেলে মালেক যদি কোনও ছলে রুখ্‌শ্‌কে নিয়ে যায়!

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সালেক বাগদাদের পথে চলেছেন; হঠাৎ এক বৃদ্ধের করুণ স্বর কানে শুনলেন। সালেক এসে বৃদ্ধের কাছে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধের আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু, মলিন মুখ, জীর্ণ বেশ, চোখে প্রকাণ্ড নীল চশমা।

দেখে তাঁর দয়া হ'ল। বৃদ্ধকে সম্বোধন ক'রে সালেক

বললেন—"আপনার কি হয়েছে বাবা? আপনি কি চান, বলুন।"

বৃদ্ধ বললে—"আমার বয়স আশি বছর পার হয়ে গেছে, বাবা। মরুভূমিতে এক আত্মীয়ের সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছিলুম। গরীব লোক আমি, আমার ঘোড়া নেই, উট নেই। পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। কিন্তু বয়স হয়েছে, চোখে ভাল নজর চলে না—ঐ পাহাড়টা পার হবার সময় একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে প'ড়ে গেছি। পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে, বাবা। অনেক কষ্টে এখান পর্য্যন্ত এসে ব'সে পড়েছি। নড়বার আর সামর্থ্য নেই। কি ক'রে যে এখান থেকে যাব, ভাবছি। নিরুপায়!"

সালেক বললেন—"কিছু ভাবনা নেই বাবা! আমার ঘোড়ার পিঠে তুলে আপনাকে আমি বাগদাদে নিয়ে যাব। আর সেখানে আপনার চিকিৎসারও ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

বৃদ্ধ বললে—"দয়ালু শেখ, আল্লা তোমার মঙ্গল করুন! কিন্তু কি ক'রে ও ঘোড়ায় উঠব, বাবা? সে শক্তি আমার নেই।"

সালেক বললেন—"সেজন্য ভাববেন না। আমি আপনাকে তুলে নিচ্ছি।"

ঘোড়া থেকে নেমে বৃদ্ধকে ঘোড়ার পিঠে তুলে সালেক চড়লেন সামনের দিকে—চ'ড়ে বাগদাদের দিকে যাত্রা করলেন। বৃদ্ধ দু'হাত দিয়ে সালেকের কোমর জড়িয়ে পিছনে ব'সে রইল।

খানিক দূর আসবার পর বৃদ্ধ হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল —"হায়, হায়, হায়! আমার সর্ব্বস্ব আমি ফেলে এসেছি!"

সালেক বললেন—"কি ফেলে এসেছেন?"

বৃদ্ধ বললে—"একটা থলি, বাবা! তাতে আমার সর্ব্বস্ব আছে। এই এত সোনার আশরফি! আর আছে আমার মেয়ে—মেয়ে ম'রে গেছে,—সেই মেয়ের মাথার এক-গোছা চুল! আশরফির জন্য দুঃখ তত নেই বাবা, কিন্তু আমার মেয়ের ঐ চুলের গোছা! সেই চুল না পেলে আমি ম'রে যাব।"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধের দু'চোখে জলধারা বইল।

দেখে সালেকের মন গ'লে গেল। সালেক বললেন—"দুঃখ করবেন না, বাবা! আপনি এই ঘোড়ায় বসুন। আমি এখনি আপনার থলি নিয়ে আসছি।"

ঘোড়া থেকে নেমে সালেক থলির সন্ধানে চ'লে গেলেন। অনেক খুঁজলেন, কোথাও সে থলি দেখতে পেলেন না। ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে অবশেষে বৃদ্ধের কাছে ফিরলেন।

কিন্তু এ কি! এসে দেখেন, ঘোড়া চালিয়ে বৃদ্ধ দূরে চ'লে গেছে! সবিস্ময়ে চীৎকার ক'রে সালেক বললেন—"তোমার এ আচরণের কারণ কি?"

এক-টানে মুখ থেকে দাড়ি-গোঁফ সরিয়ে বৃদ্ধ বললেন—

"চিনতে পার বন্ধু? আমি অসহায় বৃদ্ধ নই, তোমার বন্ধু মালেক।"

তখন সব কথা সালেকের মনে পড়ল। কিন্তু মালেককে কথা দিয়েছেন, যদি চালাকি বা ফন্দি-ফিকির ক'রে রুখ্‌শ্‌কে নিতে পারে, তাহলে রুখ্‌শ্‌ হবে মালেকের। ফন্দি-ফিকির ক'রে মালেক সত্যই তাহলে রুখ্‌শ্‌কে হস্তগত করেছেন! বাজীর সর্ত্তমত ঘোড়া এখন তাঁর।

হেসে সালেক বললেন—"বুঝেছি। বেশ, তোমার জিত! রুখ্‌শ্‌ এখন তোমার সম্পত্তি!"

মালেক চ'লে যাচ্ছিলেন। সালেক বললেন—"একটা কথা আছে, মালেক!"

দূরে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে মালেক বললেন—"যা বলবার আছে, ওখান থেকেই বল।"

সালেক বললেন—"না, কাছে এস। এত দূর থেকে সে-কথা বলা যায় না।"

মালেক বললেন—"কি জানি, রুখ্‌শ্‌কে যদি জোর ক'রে কেড়ে নাও?"

সালেক বললেন—"কথা যখন দিয়েছি, তার অন্যথা হবে না।"

মালেক বললেন—"তোমার কথার জামিন কে?"

সেকথা শুনে সালেক সবিস্ময়ে বললেন—"তুমি অবাক করলে আমায়! আরব-শেখের কথার আবার জামিনের দরকার হয় নাকি?"

কুণ্ঠিত স্বরে মালেক বললেন—"ঠিক বলেছ।"

ঘোড়া চালিয়ে মালেক এলেন সালেকের কাছে।

সালেক বললেন—"দেখ মালেক, কি ক'রে রুখ্‌শ্‌কে হস্তগত করেছ, সে-কথা কাউকে কখনও বলো না।"

মালেক বললেন—"কেন বলব না?"

সালেক বললেন—"যে-ভাবে তুমি প্রতারণা করেছ, তা জানতে পারলে মরুভূমির লোকেরা এর পর পথে আর্ত্ত লোককে সাহায্য করতে ইতস্ততঃ করবে।"

ক্ষীণ কণ্ঠে মালেক বললেন—"আচ্ছা, তাই হবে।"

ব'লে তিনি মরুভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। সালেক চললেন বাগদাদের দিকে।

একটু পরেই সালেক শুনলেন মালেকের কণ্ঠস্বর। মালেক তাঁকে দাঁড়াতে বলছেন।

কাছে এসে রুখ্‌শ্‌ থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম সালেকের হাতে দিয়ে মালেক বললেন—"ভাই সালেক, আমায় তুমি ক্ষমা কর। বাহুযুদ্ধে তোমার কাছে আগেই হেরেছি। এখন জ্ঞানের যুদ্ধেও তোমার কাছে হার স্বীকার করছি। তোমার মত মহাপুরুষকে আমি ঠকাতে পারি না। তোমার ঘোড়া তুমি ফিরে নেও।"

মালেকের চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল!

সালেক বললেন—"মহত্বের ব্যাপারে হার-জিত নেই ভাই। আমার মহত্ব যেমন তোমাকে অভিভূত করেছে, তোমার মহত্বও তেমনি আমাকে অভিভূত করেছে। আমি খুশীমনে আমার রুখ্‌শ্‌ তোমাকে দান করেছি।"

মালেক বললেন—"বেশ, রুখ্‌শ্‌ এখন আমার সম্পত্তি তো? আমিও খুশীমনে এ ঘোড়া তোমাকে দিচ্ছি। আমার এ দান তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে।"

সালেক বললেন—"তাই হবে। আমার দান তুমি গ্রহণ করেছ, আর তোমার দানও আমি গ্রহণ করছি। এখন থেকে

রুখ্‌শ্‌ তোমার কাছে থাকবে এক মাস তোমার সম্পত্তি হয়ে, তার পরের এক মাস সে থাকবে আমার কাছে আমার সম্পত্তি হয়ে। আমরা দুজনেই রুখ্‌শের মালিক।"

সালেককে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে মালেক বললেন—"ভাই, তোমার কাছে আবার আমি হার মানলুম।"

আরব-নারীর আত্মকথা

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা জয়নাব বড় মুস্কিলে পড়লেন। স্বামী ছিলেন গোত্রের শেখ বা সর্দ্দার। যত অতিথি আসত তাদের সেবা করা, বিপদে লোকের সাহায্য করা, এই সব ছিল তাঁর কাজ, আর এই কাজেই তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করেছিলেন। স্ত্রী জয়নাবের জন্য বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি।

জয়নাবের মন ছিল স্বামীরই মত উচ্চ, উদার। সামান্য যা

কিছু সঙ্গতি ছিল, মানুষের সেবার কাজে সবই তিনি অল্পদিনের মধ্যে খরচ ক'রে ফেললেন। জীবিকার জন্য তাঁর অবশিষ্ট রইল মাত্র একটি দুগ্ধবতী উট। সেই উটের দুধই তাঁর সংসারের অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল।

জয়নাবের আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। কারও কাছে তিনি কিছু চাইতে পারতেন না। অতিথি-সৎকার প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য কাজ যখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তখন নিজের দারিদ্র্য গোপন রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি গোষ্ঠীর আবাস-ভূমি থেকে কিছু দূরে নিজের বসবাসের জন্য তাম্বু স্থাপন করলেন। সমাজ থেকে দূরেই তিনি জীবন যাপন করতে লাগলেন—যাতে ক'রে কোন অতিথি বা প্রার্থী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত না হয় এই উদ্দেশ্যে।

শীতের রাত। কৃষ্ণপক্ষ। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। জনমানবের সাড়াশব্দ কোথাও নেই। আহারাদি সমাপন ক'রে জয়নাব শোবার ব্যবস্থা করছিলেন। সহসা অপরিচিতের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল—"দরজা খুলুন, কাজ আছে।"

জয়নাব দরজা খুলে দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এক সহরবাসী আরব—চেহারা এবং বেশভূষা স্পষ্টই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, লোকটি সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং অবস্থাপন্ন। আগন্তুক বিধবাকে সসম্মানে অভিবাদন করলেন। প্রথামত প্রত্যভিবাদন ক'রে জয়নাব বললেন—"মোসাফির (পথিক), কি চাই আপনার?"

আগন্তুক বললেন—"আমি দামেস্ক নগর থেকে উট কেনবার উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে এসেছি। আপনার কি বেচবার কোন উট আছে?"

আগন্তুকের কাছে নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ করতে জয়নাবের মোটেই ইচ্ছে হ'ল না। সত্য গোপন ক'রে তিনি বললেন—"আমার উটগুলো সব গোঠে চরতে গিয়েছে। বেচবার মত উট এখানে নেই।"

আগন্তুক বললেন—"বাইরে ভয়ানক অন্ধকার, পথ চেনা যাচ্ছে না। এ রাত্রের মত আমাকে আপনার তাম্বুতে থাকতে দিন্।"

জয়নাব বিধবা, কুলমহিলা। একটি মাত্র তাম্বু তাঁর। অপরিচিত মানুষকে সেখানে আশ্রয় দেওয়া যায় না। অথচ শরণাপন্ন অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা জয়নাবের পক্ষে অসম্ভব। তিনি বললেন—"আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমায় সম্মানিত করবেন এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে! ভেতরে আসুন, আপনার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

অতিথির বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে জয়নাব বললেন—"একটু অপেক্ষা করুন, আপনার আহারের ব্যবস্থা করছি।"

যথাসময়ে সুস্বাদু মাংস এবং সুরুয়া (ঝোল) পূর্ণ একটি পাত্র জয়নাব পথিকের সম্মুখে উপস্থিত করলেন।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার সমাপন ক'রে পথিক বললেন—"আপনি রাঁধতে জানেন মা! অনেকদিন এমন সুস্বাদু খাদ্য আহার করা হয় নি। আল্লা আপনার মঙ্গল করুন।"

জয়নাব বললেন—"আপনার তৃপ্তি দেখে আমার শ্রম

সার্থক হ'ল। এই তাম্বুতেই আপনি শয়ন করুন। নিকটে আর একটি তাম্বু আছে, আমি তাতে রাত্রি যাপন করব।"

সকালে পথিক দেখলেন, জয়নাবের পরণের কাপড় একান্তভাবে জলসিক্ত। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি তাঁর দিকে চাইলেন। কুণ্ঠাবনত মুখে জয়নাব বললেন—"আমার অন্য তাম্বুটি একটু দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে আসতে আসতে বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়েছি।"

আকাশ তখন পরিষ্কার। বিধবার গাত্রবাস ছিন্ন এবং মলিন। বিজ্ঞ পথিকের বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে, করুণপ্রাণ বিধবা তাঁর একমাত্র তাম্বুতে তাঁকে থাকতে দিয়ে নিজে উন্মুক্ত আকাশতলে রাত্রি যাপন করেছেন। হিমে তাঁর পরণের কাপড় ভিজে গিয়েছে।

পথিক সহজেই বুঝলেন, বিধবা জয়নাব শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছেন। এই অসহায়, নিঃস্ব বিধবার মনের উদারতার পরিচয় পেয়ে তিনি বিস্মিত, মুগ্ধ হলেন। আরবদের মধ্যে প্রথা আছে, অতিথি তার আদর-অভ্যর্থনার প্রতিদানে গৃহস্বামীকে যৌতুক স্বরূপ কিছু দিতে পারে। অবশ্য, না দিলেও কিছু আসে যায় না।

অতিথি ভাবলেন, জয়নাবের মহত্ত্বের তিনি যথোচিত প্রতিদান দেবেন। বিধবার তাতে যথেষ্ট উপকার হবে। জয়নাবকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন—"মা, আপনার উটটি একবার আমায় দিন্। আপনার জন্য সহর থেকে সামান্য কিছু নজরানা নিয়ে আসি।"

এবার জয়নাব তাঁর দারিদ্র্য গোপন করতে পারলেন না। চক্ষের জল ফেলতে ফেলতে বললেন—"হায় হায়, বাবা! গোত্রের লোক ডেকে আমার একমাত্র উটটি জবাই ক'রে তোমার রাত্রের আহার প্রস্তুত করেছিলুম।"

পথিক জয়নাবের পদচুম্বন ক'রে বললেন—"আপনি আজ থেকে সত্যিকার আমার মা। আমার মাতাপিতা অনেক দিন হ'ল পরলোকে গিয়েছেন। ধনসম্পদ আমার যথেষ্ট। দামেস্ক নগরের প্রধান ব্যবসায়ীদের আমিও একজন। আমার সঙ্গে চলুন। মায়ের অভাব আপনিই পূরণ করবেন।"

পিতার সম্মানে

রোস্তমের কথা তোমরা শুনে থাকবে। তিনি ছিলেন ইরানের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। কবে তিনি গত হয়েছেন, এখনও কিন্তু ইরানের প্রত্যেক চায়ের দোকানে, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁর অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী উৎকর্ণ হয়ে লোকে শুনে থাকে। সে কাহিনী অতি পুরাতন হলেও চিরনূতন। আজ তোমাদের তাঁর জীবনের একটি অতি করুণ কাহিনী শোনাচ্ছি।

রোস্তম শিকারে বেরিয়েছেন। বন্য জন্তুর সন্ধানে তিনি তুরানের সীমানায় এসে পৌঁছুলেন। তুরান ইরানের প্রতিবেশী রাজ্য। তুরানের জঙ্গলে তিনি একটি বন্য গর্দ্দভ দেখতে পেলেন। বন্য গর্দ্দভকে ইরানীরা উপাদেয় খাদ্য ব'লে মনে করতেন। বলা বাহুল্য, বন্য গর্দ্দভ শিকারে রোস্তমের বেগ পেতে হ'ল না। শিকারের সন্ধানে ফিরে রোস্তমের যথেষ্ট

ক্ষুধা পেয়েছিল। আগুন জ্বালিয়ে শিকারের মাংস রোষ্ট ক'রে তৃপ্তির সঙ্গে তিনি আহার করলেন। তারপর প্রিয় অশ্ব

রুখ্‌শ্‌কে চরবার জন্য ছেড়ে দিয়ে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

তুরানী বেদেরা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রোস্তমের ঘোড়াকে তা'রা গলায় ফাঁস দিয়ে বন্দী ক'রে তাদের আস্তানায় নিয়ে গেল।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে রোস্তম রুখ্‌শ্‌কে দেখতে পেলেন না। অনেক ডাকাডাকি করলেন। রুখ্‌শ্‌ সে ডাকে কিন্তু সাড়া দিল না। এদিক ওদিক খুঁজেও তার সন্ধান পেলেন না। রোস্তমের মনে তখন প্রত্যয় হ'ল চোরেরা তাকে হস্তগত করেছে। পথে ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখে বুঝলেন, দস্যুরা

তাকে তুরান রাজ্যের ভেতরে নিয়ে গেছে। বিস্ময়ে, ক্রোধে তিনি ক্ষিপ্তের মত হয়ে উঠলেন। এত সাহস, এত স্পর্দ্ধা এই তুরানী দস্যুদের! বিশ্বজয়ী বীর রোস্তমের ঘোড়া চুরি করতে তা'রা ইতস্ততঃ করলে না? এ অমার্জ্জনীয় অপরাধের উচিত শাস্তি দেওয়া চাই।

সীমান্তের ওপারেই সামেনগাঁও রাজ্য। ঘোড়ার পায়ের দাগ সেইদিকেই গিয়েছে। সামেনগাঁও রাজ্যের লোকেরাই যে তাঁর ঘোড়া চুরি করেছে সে বিষয়ে রোস্তমের সন্দেহ রইল না। সোজা তিনি রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রোস্তমের আসার সংবাদ পেয়ে সামেনগাঁওয়ের নবাব পদব্রজেই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বের হলেন। রোস্তমের নামে বড় বড় বাদশারা কেঁপে উঠতেন, সামেনগাঁওয়ের নবাব তো ক্ষুদ্র একজন করদ নরপতি।

নবাবকে দেখে ভৎর্সনার কণ্ঠে রোস্তম বললেন—"এ কি ব্যাপার নবাব সাহেব? আমি আপনার এলাকায় শিকারে এলুম, আর আমাকে ঘুমুতে দেখে আপনার প্রজারা আমার ঘোড়া চুরি ক'রে নিয়ে গেল! ঘোড়া খুঁজে বের করুন, না হলে ভাল হবে না।"

সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে নবাব সাহেব বললেন—"বীরবর, আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আপাততঃ আমাকে আপ্যায়িত করুন! ঘোড়ার সন্ধান আমি অবিলম্বে করছি।"

নবাবের অমায়িক ব্যবহারে রোস্তম খুশী হলেন। পরম যত্নে নবাব সাহেব তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন, আর প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ কক্ষগুলো তাঁর ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। রুখ্‌শের তল্লাসে চারদিকে তিনি চর পাঠালেন, আর রোস্তমের যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন।

নবাবের পাত্রমিত্র, বন্ধুবান্ধব সকলেই ভোজে উপস্থিত হলেন। কত রকমের রসনা-তৃপ্তিকর ভোজ্য, কত রকম সুস্বাদু পানীয়, কত রকম সুমিষ্ট ফলমূল যে এই রাজকীয় ভোজের জন্য এল তার বর্ণনা করা যায় না। তার ওপর আবার সঙ্গীত-বাদ্য এবং নৃত্যের বিরাট আয়োজন। দেশের শ্রেষ্ঠ গায়কেরা এসে গান গাইলেন, শ্রেষ্ঠ বাদকের দল এসে বাজাল, শ্রেষ্ঠ নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা এসে নাচলেন। অনেক রাত্রে, আসর ছেড়ে রোস্তম শয়নকক্ষে গেলেন এবং অবিলম্বে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলেন।

গভীর রাত্রে রোস্তমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে তিনি দেখলেন, স্বর্গের পরীদের মত এক পরমাসুন্দরী কিশোরী তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে তাঁর দীপধারিণী এক পরিচারিকা।

রোস্তম উঠে বসলেন আর কিশোরীকে তাঁর এই

অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মধুর কণ্ঠে কিশোরী বললেন—"আমি হচ্ছি এখানকার নবাবজাদী। আমার নাম তাহ্‌মিনা। অনাত্মীয় কোন পুরুষ এখন পর্য্যন্ত

আমার মুখ দেখে নি আর আমার কণ্ঠস্বরও শোনে নি। পর্দ্দার অন্তরালে থেকেই আমি আপনার খ্যাতির কথা শুনেছি, অতুলনীয় বীরত্বের কথা শুনেছি; শুনে মুগ্ধ হয়েছি।"

বিস্ময়-বিমুগ্ধ রোস্তম বললেন—"আপনার কথায় আমি সত্যই সুখী হলুম; কিন্তু এই অসময়ে আর এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার এখানে আসার কারণ জানতে পারি কি?"

হেসে কিশোরী বললেন—"বীরবর, সমস্ত জীবন ধ'রে

আপনি যুদ্ধই করেছেন, মানুষ বোঝবার চেষ্টা কখনও করেন নি! এই সহজ কথা আপনি বুঝতে পারছেন না যে, আপনার অতুলনীয় বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আমি মনে মনে আপনাকে বরণ করেছি। খোদার নামে শপথ করছি, আপনি ছাড়া আর কাউকে আমি স্বামিরূপে গ্রহণ করব না। আমারই চরেরা আপনার রুখ্‌শ্‌কে চুরি ক'রে এনেছে। এ ছাড়া আপনাকে আমাদের এই দীন আলয়ে আনবার আর কোন উপায় ছিল না। এখন সকাল হলে, দয়া ক'রে, বাবার কাছে আমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করবেন। লড়াইয়ের চিন্তায় এই তুচ্ছ কথাটি ভুলবেন না।"

রোস্তমের মন নবাবজাদীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি বললেন—"বেশ, তাই করা যাবে।"

প্রফুল্লমনে নবাবজাদী কক্ষ ত্যাগ করলেন।

রাত্রের প্রতিশ্রুতিমত, সকালে নবাব সাহেবের কাছে রোস্তম তাঁর কন্যা তাহ্‌মিনার পাণি প্রার্থনা করলেন।

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনে নবাব সাহেব প্রথমে বিস্মিত হলেন, তারপর রোস্তমের পদ-গৌরব, কীর্ত্তি-কলাপ প্রভৃতির কথা স্মরণ ক'রে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—"বীরবর, এ আমার পরম সৌভাগ্য! আপনি আমার জামাতা হবেন, এর চেয়ে বড় কামনা আর কি আছে?"

তাহ্‌মিনার সঙ্গে মহাসমারোহে রোস্তমের বিবাহ হয়ে গেল। রাজ্য জুড়ে উৎসব-আনন্দ, নাচ-গান, বাজী পোড়ান প্রভৃতি চলল। রোস্তমকে রাজজামাতারূপে পেয়ে সামেনগাঁও-বাসীরা এক মাস ধ'রে আনন্দ করতে লাগল।

রোস্তম বেশী দিন কোথাও ব'সে থাকবার লোক ছিলেন না। তিনমাস এখানে অতিবাহিত হবার পর তাহ্‌মিনাকে তিনি বললেন—"এবার আমায় দেশে ফিরে যেতে হবে। সেখানে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েছে।"

নবাবজাদী সাশ্রুনয়নে স্বামীকে বিদায় দিলেন। যাবার সময় রোস্তম বললেন—"তোমাকে এই কবচ দিয়ে যাচ্ছি। তোমার যদি কন্যা হয়, তাহলে একবচ তার মাথার কেশের মধ্যে রাখবে, আর যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহলে তার বাহুতে কবচ বেঁধে দেবে। সে তাহলে তার প্রপিতামহ নারিমানের মত অতুলনীয় যোদ্ধা হবে।"

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রোস্তম রুখ্‌শে চ'ড়ে দেশে ফিরলেন।

ন'মাস পরে নবাবজাদীর এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র সন্তান হ'ল। শিশু দেখতে অবিকল তার পিতা রোস্তম, পিতামহ জাল এবং প্রপিতামহ নারিমানের মতই হ'ল। দিনে দিনে শিশু বাড়তে লাগল শশিকলার মত। তার স্বাস্থ্য,

সৌন্দর্য্য, সাহস, তার বিক্রম এবং শক্তি দেখে লোকে অবাক হতে লাগল। নবাব সাহেব শিশুর নাম রাখলেন সোহরাব। বাল্য বয়সেই সোহরাবের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন মায়ের কাছে এসে সোহরাব বললেন—"লোকে আমাকে আমার বাবার কথা বলে, বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে। আমি বলতে পারি না। বাবার নাম জানি না। আমার সেজন্য বড় লজ্জা করে। বাবার নাম আর পরিচয় আমায় বল মা।"

তাহ্‌মিনা বললেন—"তোমার বাবার নাম রোস্তম। তাঁর মত বীর পৃথিবীতে আর নেই, কখন জন্মেও নি। তাঁর ভয়ে দেও, দৈত্য, দানব সকলেই সশঙ্কিত—মানুষের তো কথাই নেই।"

নবাবজাদী তারপর রোস্তমের পিতা মহাবীর জালের, তাঁর পিতা নারিমানের কীর্ত্তিকলাপের কথা সোহরাবকে বললেন। সে সব কথা শুনে সোহরাবের তরুণ হৃদয় আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। পিতার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পরিচিত হবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বললেন—"আমার বাবা রোস্তম থাকতে কায়খসরু কি ক'রে ইরানের সিংহাসনে, আর আফরাসিয়াব কি ক'রে তুরানের সিংহাসনে বসতে পারেন? আমি ওদের তাড়িয়ে বাবাকেই এই দুই সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসাব। আমার বাবাই পৃথিবীর বাদশা হবেন। এ কাজ ক'রে তবে আমি ছাড়ব।"

ভয়াতুরকণ্ঠে তাহ্‌মিনা বললেন—"ওসব খেয়াল ছাড় বাছা! তোমার বাবা একবার যদি তোমার কথা জানতে পারেন, তাহলে তখনই তোমাকে তিনি তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন। আমি আর তোমাকে দেখতে পাব না। শোকে, দুঃখে আমি তাহলে ম'রে যাব।"

একটা কথা ব'লে রাখি। সন্তানের সঠিক সংবাদ জানবার জন্য রোস্তম তাহ্‌মিনার কাছে মূল্যবান জহরত প্রভৃতি উপঢৌকন-সমেত এক দূত পাঠিয়েছিলেন। মায়ের প্রাণ—তাহ্‌মিনা ভাবলেন স্বামী যদি জানতে পারেন যে, তাঁর পুত্র সন্তান হয়েছে, তাহলে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য তিনি তখনই তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। তিনি আর ছেলের মুখ দেখতে পাবেন না। দূতের মুখে তিনি তাই সংবাদ দিয়েছিলেন তাঁর এক কন্যা হয়েছে।

যুদ্ধকেই রোস্তম জীবনে পরম কাম্য মনে করতেন। কন্যা তো আর যুদ্ধ করবে না, তাই কন্যার জন্য তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কন্যার কথা তিনি দু'দিনেই ভুলে গেলেন। তার কোন খবরাখবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। সামেন-গাঁওয়ের কথাও তিনি যুদ্ধবিগ্রহে একরকম ভুলে গেলেন।

সোহরাবকে তাহ্‌মিনা বিশেষ ক'রে বললেন—"তাঁর কথা যার তার কাছে বলো না সোহরাব! আফরাসিয়াব হলেন তুরানের সম্রাট্। রোস্তম তাঁর মহাশত্রু। আফরাসিয়াব যদি

জানতে পারেন তুমি রোস্তমের সন্তান, তাহলে জোর ক'রে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন।"

সোহরাব রোস্তমের পুত্র—সিংহ-শাবক! বিপদের নামে তাঁর বুক কাঁপে না।

তাহ্‌মিনাকে সোহরাব বললেন—"বাবার নাম কারও কাছে আমি গোপন করব না মা। আমি বাবার কাছে যাব। আমি একাই তাতারদের বাদশার সঙ্গে যুদ্ধ করব। তাঁর দল যত বড়ই হোক, বাবা আছেন ইরানে। ইরানের বাদশা কাইউস। তাঁর রাজধানী তুস। আমি তুসে যাব। কাইউসকে সিংহাসন থেকে তাড়াব। তাড়িয়ে বাবাকে সেই শূন্য সিংহাসনে বসাব। তুরানের বাদশা আফরাসিয়াবকেও আমি ছাড়ব না। তাঁর রাজ্যও আমি কেড়ে নেব। এই দুই রাজ্য মিলিয়ে আমি এক বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলব। আর সেই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হবেন আমার পিতা বিশ্ব-বিজয়ী বীর রোস্তম।"

পুত্রের উৎসাহ দেখে তাকে হারাবার আশঙ্কায় তাহ্‌মিনার দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হ'ল। কিন্তু অশ্রুর এমন শক্তি নেই বীরত্বের গৌরব-স্পৃহাকে ছেলের মন থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে! সোহরাব রোস্তমের পুত্র—তাঁর সঙ্কল্প বজ্রের মত কঠিন, পর্ব্বতের মত অটল! সোহরাব বললেন—"মা, যুদ্ধের উপযোগী একটা ঘোড়া আমায় দাও।"

নবাব সাহেবের আস্তাবলে খোঁজ পড়ল। সে আস্তাবলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রুখ্‌শের বংশধর; রুখ্‌শের মত তেজীয়ান বিদ্যুতের মত চঞ্চল এক ঘোড়া। তাকেই সোহরাবের সামনে আনা হ'ল। সে ঘোড়ার শক্তি আর গতি দেখে সোহরাব খুশী হলেন। পিঠে তার রত্নময় জিন, মুখে বল্গার রশি! ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে বসলেন বালক বীর সোহরাব।

নবাব সাহেবের অস্ত্রাগার থেকে সোহরাব ভাল ভাল বর্ম্ম, ঢাল, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি সংগ্রহ করলেন, তারপর সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন ইরানের রাজধানী তুসের অভিমুখে যাত্রা করাই তাঁর সঙ্কল্প। ইরানের বাদশা কাইউসকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে পিতা রোস্তমকে ইরানের সিংহাসনে বসাবে—এই উদ্দেশ্যে সোহরাব করতে চায় বিজয়-অভিযান!

সোহরাবের সমর-আয়োজনের সংবাদ তুরানের বাদশা আফরাসিয়াবের কাছে পৌঁছুল। সংবাদ শুনে তিনিও মেতে উঠলেন। কাইউস তাঁর পুরাতন শত্রু। তিনি ভাবলেন কাইউসের হাতে পূর্ব্বে যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, এবার তার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। বড় একদল ফৌজ পাঠালেন তিনি সোহরাবের সাহায্যের জন্য। দূতের মুখে সোহরাবকে ব'লে পাঠালেন, কাইউস তাঁরও শত্রু, সুতরাং এই দুষ্ট নরপতিকে তিনিও চান সোহরাবের সঙ্গে একযোগে শাস্তি দিতে।

আফরাসিয়াবের এ প্রস্তাবে সোহরাব সানন্দে রাজী হলেন। হুমান এবং বারমান নামে দুই বিখ্যাত যোদ্ধাকে আফরাসিয়াব তাঁর বাহিনীর সর্দ্দার নিযুক্ত করলেন। বিদায়ের সময় তাঁদের ব'লে দিলেন—"তোমরা খুব সাবধান থাকবে, রোস্তম ও সোহরাব যেন পরস্পরকে চিনতে না পারে। আর তাদের দু'জনে যাতে যুদ্ধ বাধে সে ব্যবস্থাও তোমরা করবে। সোহরাব এই সবে যৌবনে পদার্পণ করেছে, রোস্তম এখন বৃদ্ধ। কাজেই এ যুদ্ধে সোহরাব জয়লাভ করবে। যুদ্ধের ফল যদি আমাদের মনের মত হয় তাহলে যথাসময় কৌশলে সোহরাবকে হত্যা করা কঠিন হবে না। রোস্তম আর সোহরাব মারা গেলে তখন কারও সাধ্য থাকবে না আমার পথ রোধ করে! সমস্ত ইরানের সাম্রাজ্য সহজেই তখন আমার করতলগত হবে।"

আফরাসিয়াবের এই গুপ্ত আদেশ নিয়ে সেনানীদ্বয় এসে সোহরাবের সঙ্গে মিলিত হলেন। ইরানের বিরুদ্ধে তখন অভিযান সুরু হ'ল।

পথ অতিক্রম করতে করতে তা'রা সুদূর এক দুর্গের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল।

হুজীর নামে এক বিখ্যাত ইরানী যোদ্ধা দুর্গের অধ্যক্ষ। শত্রুর আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি একাই শত্রুকে বাধা

দেবার জন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। সোহরাবকে সম্বোধন ক'রে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন—

"হে যুবক, তুমি কে? কিবা তব নাম?
কি কারণে আগমন? কোথা তব ধাম?
হুজীর আমার নাম, খ্যাতি মম বিশ্বে বিঘোষিত
তোমার ও শির আজি পদতলে করিব মর্দ্দিত।"

হুজীরের আস্ফালন শুনে সোহরাব হাসলেন। তারপর দুই যোদ্ধার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। সোহরাবের বর্শার এক আঘাতে হুজীর ভূপাতিত হলেন। বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া থেকে নেমে সোহরাব তাঁকে বন্দী করলেন।

দুর্গের মালিক ছিলেন বৃদ্ধ নবাব গাসতাহিম। তাঁর কন্যা গুরদ্ আফরিদ। পুরুষের মত তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। তাঁর সাহস এবং পরাক্রম ছিল সকলের বিস্ময়ের বস্তু। হুজীরের শোচনীয় পরাজয় দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। বর্ম্মে-চর্ম্মে সজ্জিত হয়ে, অস্ত্র নিয়ে, তিনি সোহরাবের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দুর্গের বাইরে এলেন।

আফরিদের বিক্রম দেখে সোহরাব বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, এই ক্ষুদ্র যোদ্ধা—তার এত শক্তি! এমন সাহস!

সোহরাবের বক্ষ লক্ষ্য ক'রে আফরিদ সদর্পে বর্শা হানলেন —সোহরাবের বর্ম্মে সে আঘাত ব্যর্থ হ'ল—বর্শা হ'ল ভূলুণ্ঠিত।

সোহরাব সবলে রজ্জুপাশ নিক্ষেপ করলেন। সে রজ্জুপাশে

আফরিদের শিরস্ত্রাণ খসে গেল এবং নিমেষে তার বেণীবন্ধন মুক্ত হ'ল—দিব্য কেশের রাশি ঝরণাধারার মত স'রে পড়ল।

লজ্জায় আফরিদের গালে ফুটল গোলাপের আভা! সোহরাব বিস্ময়-বিহ্বলদৃষ্টিতে দেখেন—কোথায় সে তরুণ যোদ্ধা; এ যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী তাঁর সামনে!

সে রূপ দেখে সোহরাব বিমুগ্ধ হলেন, কিন্তু যোদ্ধার কর্ত্তব্য ভুললেন না। রজ্জুপাশে আফরিদকে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করলেন—আফরিদ হলেন সোহরাবের রজ্জুবাঁধনে বন্দিনী।

সোহরাবের ধরণ-ধারণ দেখে গুরদ্ আফরিদ বুঝলেন, যোদ্ধার অন্তর তাঁর এ পরাজয়ে বিগলিত হয়েছে।

কাঁদ-কাঁদ স্বরে বিজয়ী যোদ্ধাকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন—"ওগো দয়া ক'রে আমায় দুর্গে ফিরে যেতে দেও। দুর্গে যা-কিছু ধনসম্পদ আছে আমার মুক্তির বিনিময়ে সে-সব সম্পদ আমি তোমায় দেব। আমার বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। আমি তাঁর একমাত্র অবলম্বন—তাঁর জীবনের দীপশিখা! তাঁর কথা স্মরণ ক'রে আমাকে তুমি মুক্তি দাও।"

আফরিদের এ মিনতিবচনে সোহরাবের অন্তর বিগলিত হ'ল। তখনই তিনি আফরিদকে বন্ধনমুক্ত করলেন।

গুরদ্ আফরিদ দুর্গে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বাপকে পরাজয়-সংবাদ দিলেন।

সে কথা শুনে বৃদ্ধ নবাব প্রধান প্রধান সেনানী এবং সর্দ্দারদের নিয়ে এক মন্ত্রণা-সভা বসালেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হ'ল, রাত্রে গুপ্তপথ দিয়ে সকলে দুর্গ ত্যাগ ক'রে যাবেন। সোহরাবের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের আশা বিন্দুমাত্র নেই।

রাত্রিশেষে পূর্ব্বাকাশ নবারুণের রক্তরাগে রঞ্জিত হ'ল। দুর্গের দ্বারে এসে সোহরাব হাঁক দিলেন। কোন উত্তর পেলেন না। চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখলেন—কারও সাড়া-শব্দ নেই। সোহরাব তখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন। তাঁর ক্ষোভের সীমা রইল না।

গাসতাহিম ওদিকে কন্যা গুরদ্ আফরিদ এবং দল-বল নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন বাদশা কাইউসের দরবারে। বাদশাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। বললেন—"তুরান-বাহিনীর সঙ্গে এসেছে অজেয় এক বীর যুবক। তার বয়স এখনও বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করে নি। কিন্তু তার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এর পরে পূর্ণ যৌবনে সে বোধ হয় সারা পৃথিবী জয় করবে—তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সামর্থ্য কারও থাকবে না।"

বিবরণ শুনে কাইউস আতঙ্কিত হলেও তখনই তিনি বিখ্যাত যোদ্ধা গেওকে জাবুলিস্তানে পাঠালেন মহাবীর রোস্তমকে ডেকে আনবার জন্য। রোস্তমের নামে একখানি পত্রও তিনি দূতের হাতে লিখে পাঠালেন।

পত্রে তিনি লিখলেন—

সোহরাব নামে এক তরুণ যোদ্ধা তুরান-বাহিনীর সঙ্গে আসছে। আপনি ছাড়া কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। আপনি এখন ইরানের একমাত্র আশা—একমাত্র ভরসা! আপনি এসে এই বালকবীরের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করুন বীর।

চিঠি প'ড়ে রোস্তম সোহরাবের সম্বন্ধে গেওকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। গেও বললেন, তিনি শুনেছেন সোহরাব দেখতে অনেকটা জাল এবং নারিমানের মত।

বর্ণনা শুনে রোস্তম চিন্তান্বিত হলেন। তাঁরই সন্তান নয় তো! কিন্তু না, তাহ্‌মিন চিঠিতে লিখেছিলেন, তাঁর গর্ভে কন্যা জন্মেছে—পুত্র নয়। তাতে কিসের চিন্তা? না—না—না!

গেও বাদশার আহ্বানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। রোস্তম আপাততঃ সে বিষয়ে কোন তৎপরতার ভাব দেখালেন না। তিনি বিরাট এক ভোজের আদেশ দিলেন। সাতদিন ধ'রে আহার-বিহার, নাচ-গান প্রভৃতি চলতে লাগল। অষ্টম দিবসে রোস্তম বললেন—"আজকের দিনটাও আমোদ-প্রমোদে কাটান যাক।" নবম দিনে তিনি রুখ্‌শকে জিন চড়াতে আদেশ দিলেন। তারপর ভাই জোয়ারা এবং জাবুলের রণবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ক'দিন পথ অতিক্রম করবার পর তিনি শাহী দরবারে উপস্থিত হলেন।

রোস্তমের বিলম্বের দরুণ বাদশা কাইউস বিষম বিরক্ত হয়ে ছিলেন। তিনি হুকুম দিলেন—"রোস্তম এবং গেও—দু'জনকেই শূলে চড়াও।"

এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করার হুকুম দেওয়া হ'ল বিখ্যাত যোদ্ধা তুসকে। রোস্তমকে ধরবার জন্য তুস হাত বাড়ালেন। একটি ধাক্কায় রোস্তম তুসকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। তারপর লাফিয়ে রুখ্‌শের পিঠে চ'ড়ে, বাদশা কাইউসকে সম্বোধন ক'রে রোস্তম বললেন—"ওরে ক্ষীণজীব, নির্ব্বোধ, অকৃতজ্ঞ বাদশা—রোস্তমকে তুই শূলে চড়াবি! যা, সোহরাবের সঙ্গে কর গিয়ে তুই যুদ্ধ! আমার কাছে ইরানের শাহ তৃণের মত তুচ্ছ!

"খোদা ছাড়া রোস্তম কারও কাছে মাথা নোয়ায় না—কারও কাছে সে কৈফিয়ৎ দেয় না; তুই আমার বিচার করবি! তুই দিবি আমার শাস্তি!

"এ সিংহাসনে কে তোকে রেখেছে? এই রোস্তমের বাহু। রাজ্যের সমস্ত যোদ্ধা মিলে আমাকেই এ সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিল; আমার মাথায় তা'রা রাজমুকুট দিতে চেয়েছিল। আমি তখন নিজের কথা ভাবি নি। দেশের চিরাচরিত প্রথার কথা শুধু ভেবেছিলুম, পূর্ব্বপুরুষদের পবিত্র অনুশাসনের কথা ভেবেছিলুম। তাই রাজমুকুট আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলুম। আমার দৃষ্টি যদি সিংহাসনে থাকত, তাহলে ওখানে ব'সে

আমাকে অপমান করবার সুযোগ আজ তুই পেতিস্ না। তোর এ লাঞ্ছনার শাস্তি আমি এখনই দিতে পারি—কিন্তু দেব না। পূর্ব্বপুরুষদের অনুশাসন মেনে তোকে প্রাণে মারলুম না, জানিস্।"

এই কথা ব'লে রোষবশে রোস্তম প্রস্থান করলেন। শাহী দরবারের যোদ্ধা এবং অমাত্যদের মন দুশ্চিন্তায় ভ'রে গেল। তাঁদের মনে হ'ল, পরাজয় এবার সুনিশ্চিত, সাম্রাজ্য আর রক্ষা করা যাবে না। পরামর্শ ক'রে তাঁরা তখন ছুটলেন গোদরজের কাছে।

একমাত্র গোদরজই এখন ঘটনাচক্রের গতি ফেরাতে পারেন। গোদরজকে বাদশা খুব সম্মান করতেন। সভাসদদের অনুরোধমত তিনি বাদশাকে গিয়ে বোঝালেন। গোদরজের কথা শুনে বাদশার মেজাজ ঠাণ্ডা হ'ল। গোদরজ তখন রোস্তমের কাছে গেলেন। রোস্তমের ক্রোধ—সে যেন বজ্রাগ্নি! গোদরজের কথা প্রথমে তিনি শুনতেই চাইলেন না। কিন্তু গোদরজও ছিলেন বিচক্ষণ রাজনীতিক। ধীরে ধীরে সময়োচিত বাক্য-প্রয়োগে তিনি রোস্তমের মনকে শান্ত করতে লাগলেন। রোস্তমকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন—"বীরবর, বাদশার চরিত্র তো আপনি জানেন। মূর্খ—তার ওপর কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং বিষম খেয়ালী। তবে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, তাঁর রাগ বেশীক্ষণ থাকে না। নিজের খামখেয়ালের

জন্য নিজেই খুব অনুতপ্ত হন। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। এখন তাঁর অনুতাপের সীমা নেই। তিনি এখন আপনার সঙ্গে মিতালী করবার জন্য অধীর। আপনি যদি সদয় না হন, আপনি যদি তাঁকে ক্ষমা না করেন, তাহলে সর্ব্বনাশ হবে। শত্রুর নির্ম্মম হস্তে ইরানীরা ধ্বংস হবে। ইরান রাজ্য রসাতলে যাবে। আর এর শেষ দায় আপনার। আপনি ছাড়া কেউ এখন ইরানকে রক্ষা করতে পারে না। আপনি কি আপনার দেশবাসীদের পরাধীন হতে দেবেন? আপনি বেঁচে থাকতে ইরানবাসী গোলামীর শৃঙ্খল পরবে? হয়তো অপযশ রইবে যে এক অজাত-শ্মশ্রু বালকের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হতে রোস্তমের সাহস হয় নি।"

গোদরজের কথায় রোস্তমের রাগ পড়ল। তাঁর সঙ্গে রোস্তম শাহী দরবারে ফিলে এলেন। বাদশা সিংহাসন থেকে নেমে এসে রোস্তমের সম্বর্দ্ধনা করলেন; যথোচিত সম্মান দেখালেন—তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

রোস্তমও বাদশার বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং যুদ্ধের ভার গ্রহণে সম্মতি জানালেন।

বাদশা বললেন—"বীরবর, আপনার উত্তরে আশ্বস্ত হলুম। তবে আজ আপনি এখানেই থাকুন। আজ ভোজ আর উৎসব হোক। কাল আমরা যুদ্ধযাত্রা করব।"

সমস্ত রাত ধ'রে ভোজ-উৎসব, নাচ-গান চলল। পরের

বাদশা সিংহাসন থেকে নেমে এসে রোস্তমের সম্বর্দ্ধনা করলেন

দিন প্রত্যূষে রোস্তমের নেতৃত্বে ইরান-বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা সুরু করল।

দুর্গের উচ্চ বুরুজ থেকে সোহরাব এই বিরাট বাহিনী দেখলেন। হুমানকে ডেকে সোহরাব বললেন—"একবার চেয়ে দেখুন! ইরানী ফৌজে দিগন্ত ছেয়ে গেছে।"

সে দৃশ্য দেখে হুমানের মুখ পাণ্ডুর হ'ল। স্মিতহাস্যে সোহরাব বললেন—"পরওয়া নেই। খোদার হুকুমে এই বিরাট বাহিনীকে আমি বিধ্বস্ত ক'রে দেব।" একজন দাসকে সম্বোধন ক'রে সোহরাব বললেন—"এক পেয়ালা শরাব আন্। এখানে ব'সে তামাসাটা একটু উপভোগ করি।"

তারপর বুরুজ থেকে নেমে সোহরাব কেল্লার বাইরের ময়দানে নিজের তাম্বুতে গিয়ে বসলেন। তুরানের সেনানী দল সেখানে সমবেত হ'ল, যুদ্ধের বিষয় পরামর্শ করবার জন্যে।

রোস্তম ছদ্মবেশে তুরানীদের শিবিরে প্রবেশ করলেন তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য। দেখলেন তুরানী সর্দ্দার এবং সেনানীদের সঙ্গে সভায় ব'সে সোহরাব সুরাপানে এবং আমোদ-প্রমোদে মশগুল।

জেন্দা নামে এক তুরানী সেনানী ভোজ-সভা ত্যাগ ক'রে বাইরে এল। জেন্দা দেখল মানুষের একটা ছায়া। মানুষটি এক কোণে লুকিয়ে আছে আর মাটির ওপর তার ছায়া পড়েছে। জেন্দা সেই প্রচ্ছন্ন মানুষটির দিকে অগ্রসর হ'ল।

নিকটে এসে পরুষকণ্ঠে জেন্দা বললে—"কে তুমি?" কোন উত্তর না দিয়ে রোস্তম তার স্কন্ধদেশে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করলেন। সেই একটি ঘুষিতেই জেন্দার জীবনলীলা শেষ হ'ল! রোস্তম তখন নিঃশব্দে সেখান থেকে স'রে পড়লেন।

খানিকক্ষণ পরে আর একজন যোদ্ধা ভোজ-সভা থেকে বার হলেন। জেন্দার মৃতদেহ তাঁর চোখে পড়ল। তিনি আলো নিয়ে এলেন এবং মুখ দেখে জেন্দাকে চিনতে পারলেন। শিবিরে হট্টগোলের সৃষ্টি হ'ল। সোহরাব বুঝলেন, এ ইরানীদের কাজ। নিঃশব্দে গুপ্তভাবে শিবিরে প্রবেশ ক'রে জেন্দাকে তা'রা হত্যা ক'রে গেছে। খোদাকে সাক্ষ্য ক'রে তিনি শপথ করলেন—এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবেন; আর বাদশা কাইউসের কাছ থেকেই নেবেন—যেখানেই তিনি থাকুন না কেন!

শিবিরে ফিরে এসে বাদশা কাইউসকে রোস্তম বললেন—"আশ্চর্য্য এক যুবককে দেখে এলুম। তুরান দূরের কথা, ইরানেও এমন সুপুরুষ আছে ব'লে মনে হয় না। দীর্ঘ ঋজু দেহ, ঠিক যেন একটা দেবদারু গাছ! বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা, —বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ; দেখে আমার পিতা জালের কথা মনে পড়ল। এ যেন অবিকল তাঁর প্রতিমূর্ত্তি!"

সকাল হ'ল। সোহরাব হুজীরকে দুর্গের বুরুজে নিয়ে

গেলেন। তাঁকে সম্বোধন ক'রে সোহরাব বললেন—"আমার কথার সঠিক উত্তর দিন্। আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে।"

তারপর সোহরাব তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলেন—"ঐ শিবির কার—চারদিকে যার হাতীর পাহারা?"

হুজীর বললেন—"বাদশা কাইউসের।"

সোহরাব বললেন—"ওর ডানদিকে ঐ শিবির কার?"

হুজীর বললেন—"সেনানী তুসের।"

সোহরাব বললেন—"ঐ লাল শিবির কার?"

হুজীর বললেন—"গোদরজের।"

সোহরাব বললেন—"ঐ সবুজ তাম্বু কার? ওর ভেতর দেখছি একটা সিংহাসন রয়েছে!"

হুজীর রোস্তমের তাম্বু চিনতেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন আমি যদি রোস্তমের তাম্বু দেখিয়ে দেই, তাহলে সোহরাব হয়তো এখখুনি গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে পারেন আর বীরবরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে হত্যা করতেও পারেন। সুতরাং রোস্তমের উপস্থিতির কথা গোপন রাখাই ভাল। এই ভেবে তিনি বললেন—"ও শিবির হচ্ছে চীন-সেনাপতির। চীনের বাদশা ইরানের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছেন। চীন-সেনাপতি ঐ শিবিরে আছেন।"

সোহরাব বললেন—"তাঁর নাম আপনার জানা আছে?"

হুজীর বললেন—"না, তাঁর নাম আমার জানা নেই।"

সোহরাব ভাবলেন,—আমি তো রোস্তমের সব নিদর্শনই ঐ তাম্বুতে পাচ্ছি। মা তো সব নিদর্শন আমাকে ব'লে দিয়েছেন! তবে কেন আমি প্রতারিত হচ্ছি?

হুজীরকে আবার তিনি ঐ প্রশ্ন করলেন। হুজীর সেই একই উত্তর দিলেন।

অধীর হয়ে সোহরাব বললেন—"রোস্তমের তাম্বু তাহলে কোথায়?"

হুজীর বললেন—"আমার মনে হচ্ছে, তিনি এখনও জাবুলিস্তান থেকে এসে পৌঁছোন নি।"

সোহরাব ম্রিয়মাণ হলেন। মা তাঁকে যে সব নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, সে সব তিনি ঐ সবুজ তাম্বুতে দেখছেন, অথচ হুজীর বলছেন ওটা রোস্তমের তাম্বু নয়। হুজীরকে তিনি আরও প্রশ্ন করলেন—মিষ্ট কথায় তাঁর অন্তর জয় করবার চেষ্টা করলেন। সোহরাব হুজীরকে বললেন—"ভাল ক'রে চারদিকে একবার দেখুন। আপনি যদি রোস্তমের তাম্বু দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দেব।"

হুজীর বললেন—"আজ্ঞে; রোস্তমের তাম্বু দেখতে কতকটা ঐ রকম বটে, কিন্তু ওটা রোস্তমের তাম্বু নয়।"

তারপর হুজীর রোস্তমের গুণ কীর্ত্তন করতে লাগলেন; বললেন—"তাঁর মত যোদ্ধা কখনও দেখা যায় নি। একবার যুদ্ধে মেতে গেলে শত সহস্র লোকও তাঁর সামনে দাঁড়াতে

পারে না। হাতী, বাঘ, সিংহ এরাও তাঁর মূর্ত্তি দেখে ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়।"

সোহরাব বললেন—"আমার কাছে রোস্তমের অত প্রশংসা ক'রে কি লাভ? প্রকৃত বীর কেমন ক'রে যুদ্ধ করেন আপনি তো কখনও তা দেখেন নি। শুনুন মশায়, ওসব চালাকি চলবে না। এখনই আমায় রোস্তমের তাম্বু দেখিয়ে দিন্, তা যদি না করেন, তাহলে আপনাকে মরতে হবে।"

হুজীর দেশ-প্রেমিক; ভাবলেন, তিনি মরলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বাদশা কিংবা রোস্তম মরলে ইরানের সর্ব্বনাশ হবে। এঁদের জীবনের তুলনায় তাঁর জীবন অতি তুচ্ছ। দেশের যাতে ভাল হয় তিনি তাই করবেন। সোহরাবকে সম্বোধন ক'রে ধীর, স্থির কণ্ঠে তিনি বললেন—"আমাকে হত্যা করবার জন্য আপনি অজুহাত খুঁজছেন কেন? আমি তো আপনার বন্দী—ইচ্ছা হলেই আমাকে হত্যা করতে পারেন।"

সোহরাব বুঝলেন, হুজীয়ের কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। বুরুজ থেকে নেমে বর্ম্ম-চর্ম্ম প'রে সোহরাব তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

বাদশা কাইউসের শিবিরের সম্মুখে গিয়ে সোহরাব বললেন —"আমি শপথ করেছি, জেন্দার হত্যার প্রতিশোধ আমি কাইউসের উপর দিয়ে নেব। তাঁর যদি কিছুমাত্র বীরত্বের গর্ব্ব বা মর্য্যাদা-বোধ থাকে, আমার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করুন।"

আলবুরুজ পর্ব্বতের মত মাথা উঁচু ক'রে সোহরাব সেই প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সামনে আসবার সাহস কোন ইরানী যোদ্ধার হ'ল না। ভয়ে তা'রা চুপ ক'রে রইল।

এইভাবে খানিকক্ষণ কাটল। সোহরাব আবার বাদশাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন; বললেন—"ওহে ইরানের বাদশা, এ কি তোমার কাপুরুষতা! বাদশা হয়ে যুদ্ধ করতে তুমি ভয় পাচ্ছ! সিংহের আসনে ব'সে শৃগালের মত ব্যবহার করছ? তোমায় ধিক্! বীরের সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ করবার ক্ষমতা যখন তোমার নেই, বৃথাই তুমি শাহিন-শাহ নাম ধারণ করেছ।"

তরুণ যোদ্ধার সাহস এবং ধৃষ্টতা দেখে বাদশা অবাক হলেন। ইরানের অসংখ্য যোদ্ধার মধ্যে তাঁর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হতে কেউ সাহস করছে না। রোস্তমকে তিনি তাঁর মান রক্ষা করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন।

রোস্তমের কিন্তু সেদিন যুদ্ধ করবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি ব'লে পাঠালেন—"আজকের দিন আর কাকেও যুদ্ধ করতে দিন্। তিনি যদি পরাজিত হন, তাহলে কাল আমি যুদ্ধ করব।"

বাদশা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে তুসকে তখন রোস্তমের কাছে পাঠালেন। তুস ইরানের যোদ্ধাদের আতঙ্কের বিষয় রোস্তমকে অবহিত করলেন; বাদশার ক্ষোভের কথাও তাঁকে

বললেন। অগত্যা রোস্তম যুদ্ধে নামতে সম্মত হলেন এবং বর্ম্মে চর্ম্মে সজ্জিত হয়ে তাম্বু থেকে বের হলেন।

যেতে যেতে রোস্তম সোহরাবের সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। এই যুবক কি কোন দেও, না দৈত্যের বংশধর? না হলে ইরানের বড় বড় বিখ্যাত যোদ্ধা ওকে এত ভয় করবে কেন? কেনই বা ওর সঙ্গে যুদ্ধে তা'রা পরাঙ্মুখ হবে?

রোস্তম এসে দাঁড়ালেন সোহরাবের সামনে। সোহরাবকে দেখে মনে উদয় হ'ল চকিতের জন্য বিহ্বলতা! সে বিহ্বলতা কাটল সোহরাবের কণ্ঠস্বরে।

সোহরাব বললেন—"চলুন একটু নিরালা জায়গায় গিয়ে আমরা যুদ্ধ করি। লোকে তাহলে আমাদের যুদ্ধ দেখতে পাবে না।"

রোস্তম এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। দু'জনে এক নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হলে সোহরাব বললেন—"আমার সঙ্গে যুদ্ধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আপনার মৃত্যু আজ অনিবার্য্য।"

রোস্তম বললেন—"কথার আস্ফালন কেন? তুমি তো দেখছি শিশুমাত্র! যুদ্ধের তুমি কি জান? যাঁরা সত্যকার বীর, কি ভাবে তাঁরা যুদ্ধ করেন তোমার তা জানা নেই। আমি একজন প্রবীণ যোদ্ধা। শ্বেত অসুরকে আমি হত্যা করেছি, তার অসুর বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করেছি। আমার

সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি কেউ পার পায় নি! তবে তোমাকে দেখে আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হচ্ছে। তোমাকে আমি হত্যা করতে পারব না। আমাদের দু'জনের যুদ্ধ করবার দরকার নেই। তোমার তরুণ বয়স, সাহস এবং উৎসাহ দেখে তোমাকে হত্যা করবার প্রবৃত্তি আমার হয় না।"

সোহরাব বললেন—"আপনিই তাহলে রোস্তম?"

রোস্তম বললেন—"না, আমি তাঁর দাসানুদাস।"

উত্তর শুনে সোহরাবের মনের সব আশা নির্ব্বাপিত হ'ল। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

প্রথমে বর্শা নিয়ে দু'জনেব যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। দু'জনের অস্ত্র খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। তারপর তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ। দু'জনের তলোয়ারই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তারপর গদা নিয়ে যুদ্ধ। এমন ভীষণ যুদ্ধ চলল যে, দু'জনের দেহের বর্ম্ম কাপড়ের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্রও বেঁকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। দু'জনের ঘোড়াও একান্ত ক্লান্ত; ঘোড়ার গা বেয়ে দর-বিগলিত ধারে স্বেদ-ধারা এবং দুই যোদ্ধার দেহ থেকে রক্ত ও স্বেদ গড়িয়া পড়ছে। পিপাসায় দু'জনেই কাতর হলেন। নিশ্বাস নেবার জন্যে দু'জনেই ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়ালেন।

রোস্তম ভাবলেন, দেও, দৈত্য, দানব, মানব সকলের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করেছি। কাকেও তো এমন যুদ্ধ করতে

দেখি নি! এমন শক্তি, এমন ক্ষিপ্রতা কারও থাকতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত!

উৎফুল্ল কণ্ঠে সোহরাব বললেন—"আপনি জিরিয়ে নিন, তারপর ধনুর্ব্বাণ নিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষা করা যাবে।"

ধনুর্ব্বাণ নিয়ে যুদ্ধ সুরু হ'ল। তাতেও হার-জিত কিছুই হ'ল না। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে দু'জনে মল্লযুদ্ধে মত্ত হলেন। সোহরাবকে মাটি থেকে তোলবার জন্য রোস্তম তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। সে শক্তি যদি পর্ব্বতের ওপর প্রয়োগ করতেন বোধ হয় পর্ব্বতও ভূমিশয়ন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠত! সোহরাবকে কিন্তু কিছুতেই ওঠাতে পারলেন না।

সোহরাব তারপর রোস্তমকে তোলবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। কোন ফল হ'ল না। দু'জনে তখন পরস্পর থেকে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ সোহরাব লৌহদণ্ড দিয়ে সজোরে রোস্তমের মস্তকে আঘাত করলেন। সে আঘাতের বেগে রোস্তম ক্ষণেকের জন্য চারদিক অন্ধকার দেখলেন! রোস্তমের অবস্থা দেখে সোহরাব তাঁকে উপহাস করলেন। রোস্তম বললেন—"রাত হয়ে আসছে। আজ আর নয়! কাল আবার যুদ্ধ হবে।"

সোহরাব বললেন—"বেশ, তাই হবে। আজকের জন্য আপনাকে যা দিয়েছি, তা' যথেষ্ট! এবার বাদশা কাইউসকে আমার তলোয়ারের তীক্ষ্ণতাটা একবার অনুভব করাতে হবে।"

ইরানীদের শিবিরের দিকে সোহরাব অশ্ব-চালনা করলেন। রোস্তম প্রতিশোধ নেবার জন্যে তুরানীদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হলেন। যেতে যেতে বার বার মনে হ'ল বাদশা কাইউসকে তিনি অরক্ষিত রেখে এসেছেন। তখনই ইরানী শিবিরের দিকে ফিরলেন। ফিরে এসে দেখেন সোহরাব তুমুল হত্যাকাণ্ড সুরু করেছে। অনেক ইরানী যোদ্ধাকে নিহত করেছে, আর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে! সোহরাবকে সম্বোধন ক'রে রোস্তম বললেন—"আজকের মত যুদ্ধ স্থগিত থাক। এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তাহলে একা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

সোহরাবও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রোস্তমের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। উভয়ে তখন নিজ নিজ তাম্বুতে ফিরে গেলেন।

সন্ধ্যার পর রোস্তমকে কাইউস নিজের শিবিরে ডেকে পাঠালেন।

কাইউস বললেন—"এমন পরাক্রম কোন মানুষের কখনও দেখি নি। এ যুবক বিস্ময়ে আমাকে স্তম্ভিত করেছে!"

রোস্তম বললেন—"আপনি ঠিক বলেছেন। মনে হয় যুবকের দেহ যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরী। তলোয়ার, ধনুর্ব্বাণ, গদা সব দিয়েই ওকে আক্রমণ করেছি। কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারি নি! যুদ্ধের কৌশলে আমাকেও ও হার

মানিয়েছে। কালকের যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, শুধু খোদাই বলতে পারেন।"

রোস্তম নিজের তাম্বুতে ফিরে এলেন। দীর্ঘকাল ধ'রে খোদার কাছে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ভাই জোয়ারাকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"আমি বেশ বুঝেছি যুদ্ধের ব্যাপারে এ যুবকের তুলনা নেই। কালকের যুদ্ধে যদি অঘটন কিছু ঘটে, তাহলে তুমি পিতা জালের কাছে ফিরে যাবে। বিজয়ী এই তাতারকে বাধা দেবার চেষ্টা করো না। নিশ্চয় জেনো, সমস্ত ইরান একদিন এর করতল-গত হবে।" ... ...

তাতার শিবিরে ফিরে হুমানকে সম্বোধন ক'রে সোহরাব বললেন—"এই বৃদ্ধের শক্তি এবং ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় উনিই রোস্তম। আমার মা যে সব নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন ওঁর মধ্যে তার প্রত্যেকটিই দেখতে পাচ্ছি।"

হুমান বললেন—"রোস্তমকে বহুবার আমি দেখেছি। তাঁকে আমি খুব চিনি। ইনি রোস্তম নন্। এঁর ঘোড়া দেখতে রুখ্শের মত বটে, কিন্তু রুখ্শ্ নয়।"

হুমানের কথা শুনে সোহরাব ভাবলেন, তারই তবে ভুল হয়েছে। ইরানী যোদ্ধা তাঁর পিতা রোস্তম নন্।

সকাল হতে না হতেই উভয় যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। রোস্তমকে দেখেই সোহরাবের মনে স্নেহের

সঞ্চার হ'ল। ইরানী যোদ্ধাকে সম্বোধন ক'রে সোহরাব বললেন—"যুদ্ধ ক'রে কাজ নেই। আসুন আমরা বন্ধুভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই।" তিনি আরও বললেন—"যুদ্ধের চিন্তা ছেড়ে আমরা একসঙ্গে বসি আসুন। অন্যে যুদ্ধ করে করুক, আমরা পরস্পরকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করি। আপনাকে দেখে আমার মনে কি মায়া যে উথলে উঠছে! আমার দু' চোখে অশ্রুর বাষ্প ঘনিয়ে উঠছে। আপনার নাম জানার জন্য আকুলতার সীমা নেই। হে বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা! দয়া ক'রে আপনার নামটি যদি বলেন।"

রোস্তম বললেন—"কই কাল তো এসব কথা হয় নি। আজ মল্লযুদ্ধের কথা আছে। আমি চালাকি জানি না। মিষ্ট কথায় ভোলার অভ্যাস আমার নেই। আমি তোমার মত খামখেয়ালী শিশু নই। যুদ্ধ করতে এসেছি। এস, যুদ্ধ করি।"

সোহরাব দেখলেন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মল্লযুদ্ধের জন্য সোহরাব ঘোড়া থেকে নামলেন। রোস্তম আগেই নেমেছিলেন। দু'জনে আবার তুমুল মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

সিংহের বিক্রমে দুই যোদ্ধা লড়তে লাগলেন। দু'জনের দেহ বেয়ে শোণিত এবং স্বেদের ধারা বইতে লাগল। সোহরাব মত্ত হস্তীর মত শক্তি প্রয়োগ ক'রে রোস্তমকে মাটি থেকে উর্দ্ধে তুললেন, পরক্ষণেই তাঁকে ভূমিতলে নিক্ষেপ ক'রে

তাঁর বুকের ওপর চেপে বসলেন। তারপর রোস্তমের মস্তক ছেদন করবার উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা উদ্যত করলেন।

সোহরাবকে সম্বোধন ক'রে রোস্তম বললেন—"আমাদের দেশে প্রথা আছে, প্রথমবার কোন যোদ্ধা ভূতলে নিক্ষিপ্ত হলে তার মস্তক ছেদন করা হয় না। দ্বিতীয় বারে যুদ্ধে যদি সে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হয়, তবেই তার মস্তক ছেদন করা হয়।"

রোস্তমের কথা শুনে সোহরাব ছুরি আবার খাপের ভেতর পূরে রাখলেন—রেখে রোস্তমকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রোস্তম ভূশয্যা থেকে গাত্রোত্থান করলেন।

সোহরাব শিবিরে ফিরে হুমানকে সেদিনকার ঘটনার কথা বললেন। হুমান বললেন—"হায়, হায়, কি ভুলই করেছেন! সিংহকে জালে পেয়ে মুক্ত করা,—ভয়ঙ্কর অন্যায়। যথাসময় সে যাতে আপনাকে ভক্ষণ করতে পারে, তার সুযোগ তাকে দিলেন! এর চেয়ে নির্ব্বোধের কাজ আর কি হতে পারে?"

সোহরাব বললেন—"কেন? সে ত আমার আয়ত্তের মধ্যেই আছে। তার শক্তি, সামর্থ্য এবং যুদ্ধকৌশল আমার চেয়ে কম। কালও আমি তাকে ভূপাতিত করতে পারব।"

হুমান বললেন—"জ্ঞানী জন কখনও শত্রুকে দুর্ব্বল কিংবা তাচ্ছল্যের বস্তু ব'লে মনে করে না।"

শিবিরে ফিরে গিয়ে রোস্তম স্নান করলেন—সারা রাত ধ'রে খোদার কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন—

"হে সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভু! আমার যৌবনের বল, যৌবনের ক্ষিপ্রতা আমায় ফিরিয়ে দাও। আমি আজীবন তোমার সেবায়, আমার শক্তি নিয়োজিত করেছি। এক বালকের হাতে আজ তুমি আমায় লাঞ্ছিত করো না।"

পরের দিন যথাসময়ে রোস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বিজয়ের গর্ব্বে সোহরাব বললেন—"এই যে আবার আপনি যুদ্ধ করতে এসেছেন!" ... ...

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুস্তি চলল। সে এক ভীষণ ব্যাপার। এমন কুস্তি পৃথিবীতে কখনও হয় নি। বিরাট দুই পর্ব্বত যেন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে মেতেছে!

শেষে রোস্তম তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে সোহরাবকে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন, আর তাঁর বুকের ওপর চেপে বসলেন। সোহরাব উঠবার জন্য বারবার চেষ্টা ক'রেও নিষ্ফলকাম হলেন। রোস্তম ভাবলেন এ যোদ্ধাকে বেশীক্ষণ তিনি চেপে রাখতে পারবেন না। সোহরাবের জীবনলীলা শেষ করবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পার্শ্বদেশে সজোরে ছুরিকাঘাত করলেন। ছুরি সোহরাবের হৃৎযন্ত্রে বিদ্ধ হ'ল।

মরণোন্মুখ সোহরাব ব্যথাবিজড়িত কণ্ঠে বললেন—"হায় আমার ভাগ্য! পিতার সন্ধানে এখানে এসে আমি জীবন বিসর্জ্জন দিলুম। হে বৃদ্ধ যোদ্ধা! তুমিও তোমার মরণকে ডেকে এনেছ। কাকে তুমি হত্যা করছ, জান না। এরপর

সমুদ্রের গর্ভে মৎস্যদের মধ্যে গিয়েও যদি তুমি লুকাও, সুদূর আকাশে গিয়ে যদি নক্ষত্রের আশ্রয় নাও, তবু নিজেকে তুমি রক্ষা করতে পারবে না। আমার পিতা যখন শুনবেন, তুমি তাঁর একমাত্র সন্তানকে

হত্যা করেছ, তখন তিনি এ হত্যার শোধ না নিয়ে ছাড়বেন

না। মানব, দানব, দেও, দৈত্য কেউ তাঁর পথরোধ করতে পারবে না।"

রোস্তম বললেন—"যুবক, কে তোমার পিতা? কাকে লক্ষ্য ক'রে তুমি এত সব বড় বড় কথা বলছ?"

বিজড়িতকণ্ঠে সোহরাব বললেন—"আমার পিতা হলেন বিশ্বজয়ী বীর রোস্তম। আমার মা সামেনগাঁওয়ের নবাবনন্দিনী তাহ্‌মিনা।"

উত্তর শুনে রোস্তম চারদিক অন্ধকার দেখলেন। তাঁর সংজ্ঞা লুপ্ত হ'ল। মাটির ওপরে তিনি লুটিয়ে পড়লেন! যখন সংজ্ঞা ফিরে এল, সোহরাবকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন—

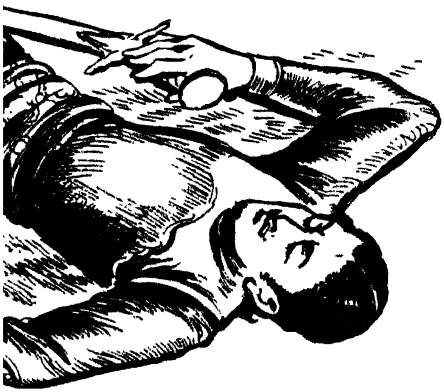

—"যুবক, রোস্তমের কি নিদর্শন তোমার কাছে আছে? বল, শীঘ্র বল, আমিই রোস্তম।"

সোহরাব বললেন—"আপনি? আপনি আমার পিতা? আমার মনও তাই বলছিল। কিন্তু আপনার মন তো আমার কথায় সাড়া দেয় নি! আপনি যদি নিদর্শন

দেখতে চান, আমার বর্ম্ম খুলুন। আমার মা যে কবচ আমার বাহুতে বেঁধে দিয়েছেন, দেখুন। সে কবচ আপনিই তাঁকে দিয়েছিলেন।"

সোহরাবের নির্দ্দেশমত, বর্ম্ম খুলে রোস্তম দেখলেন—সেই কবচ! করুণ আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে রোস্তম বললেন—"হায়, হায়, আমার অন্তরের ধন, আমার জীবনের কামনা, আমার একমাত্র সন্তান, আমার বংশের গৌরব, তোমাকে স্বহস্তে আমি হত্যা করেছি! নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছি! আমার মত হতভাগা পিতা পৃথিবীতে আর কে আছে? এ মহাপাপের কথা কখনও আমি ভুলতে পারব না। বেঁচে থাকা এখন আমার পক্ষে মস্ত বড় অভিশাপ। এখন আত্মহত্যাই আমার মুক্তির একমাত্র পথ।"

নিজের জীবন-লীলা শেষ করবার জন্য রোস্তম তীক্ষ্ণ ছুরিকা উদ্যত করলেন—যে ছুরিকার আঘাতে তাঁর প্রাণাধিক সোহরাবকে তিনি হত্যা করেছেন। কাতরকণ্ঠে সোহরাব নিষেধ জানালেন। পিতাকে সম্বোধন ক'রে সোহরাব বললেন—"ভাগ্যের খেলা! এ অনিবার্য্য। পিতার হাতে মরবার জন্যই আমি জন্মেছিলুম। আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন। পিতা, আমাকে একাই যেতে দিন্।"

শোকের আতিশয্যে রোস্তম মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বাদশা কাইউসের লোকেরা দেখলে রোস্তমের ঘোড়া সওয়ার-

শূন্য। তা'রা বাদশার কাছে গিয়ে খবর দিলে, যুদ্ধে রোস্তম নিহত হয়েছেন। সংবাদ শুনে ইরানবাসীরা 'হায় হায়' করতে লাগল। সঠিক খবর জানবার জন্য বাদশা বিশ্বস্ত দূত পাঠালেন। যুদ্ধস্থলে এসে দূত দেখেন, রোস্তম মাটিতে প'ড়ে করুণ বিলাপ করছেন, আর সোহরাব মরণাপন্ন।

রোস্তমের শির দূত নিজের কোলে তুলে নিলেন। প্রকৃত ব্যাপার কি তাঁর কাছে জানতে চাইলেন। রোস্তম বললেন —"আমি মহাপাপ করেছি। স্বহস্তে পুত্রহত্যা করেছি!"

রোস্তমের ভাই জোয়ারাও ইতিমধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি সোহরাবের দিকে চাইলেন। সোহরাব বললেন—"তকৃদীরের লেখা। পিতার হাতেই আমার মৃত্যু লেখা ছিল। আমি এসেছিলুম বিদ্যুৎ-শিখার মত। বাতাসের মত আমি ভেসে যাচ্ছি।"

রোস্তম এবং জোয়ারা বিলাপ করতে লাগলেন। সোহরাব বললেন—"পৃথিবীতে চিরকাল কেউ থাকে না। দুঃখ ক'রে কি লাভ?" তারপর রোস্তমের দিকে চেয়ে বললেন—"বাবা, আমার সঙ্গে যারা এই অভিযানে এসেছে তা'রা যেন দুঃখ না পায়। আমিই তাদের নিয়ে এসেছি, তাদের কোন দোষ নেই।"

রোস্তম এবিষয়ে তাকে আশ্বাস দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেই তরুণ বীরের প্রাণবিহঙ্গ দেহের স্বর্ণপিঞ্জর ছেড়ে স্বর্গের কুঞ্জবনে গিয়ে আশ্রয় নিল। ... ...

রোস্তমের কথায় উভয় রাজ্যে সন্ধি হ'ল। হুমান তাতার বাহিনীকে নিয়ে তুরানে ফিরে গেলেন। বাদশা কাইউস ইরানী বাহিনীকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

সোহরাবের মৃতদেহ মহামূল্য আধারে বয়ে রোস্তম নিজের পিতার রাজ্য সিস্তানে নিয়ে গেলেন। রোস্তমের বৃদ্ধ পিতা জাল এ দুর্ঘটনায় শোকে অভিভূত হলেন। রোস্তমের জননী সন্তানের দুঃখে চোখের জলে সারা হলেন। সারা দেশে শোকের করাল ছায়া। সিস্তানের রাজবংশের সমাধিস্থানে সোহরাবের দেহ সমাহিত করা হ'ল। রোস্তম তার ওপর বিরাট স্মৃতিসৌধ স্থাপন করলেন। সে সৌধ এখনও আছে।

সোহরাবের মৃত্যুর সংবাদ সামেনগাঁও রাজ্যে গিয়ে পৌঁছুল। সোহরাবের মাতা নবাবজাদী তাহ্‌মিনা তাঁর আদরের দুলাল, একমাত্র পুত্ররত্নের করুণ মৃত্যুর এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ শুনে পাগলিনীর মত হলেন। প্রকাণ্ড চিতা জ্বালিয়ে নিজেকে তিনি সে চিতায় নিক্ষেপ করলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা অতি কষ্টে আগুন থেকে তাঁর দেহকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণ রক্ষা করতে পারলেন না। মায়ের প্রাণ স্বর্গে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণের সঙ্গে গিয়ে সম্মিলিত হ'ল।

লেখার পরিবেশ

খলিফা হারুণার রসিদের প্রাসাদে আজ বাগদাদের প্রধান কাজী ইয়াকুবের নিমন্ত্রণ। কাজীকে খলিফা বড় ভালবাসতেন। তার কারণও ছিল। সে যুগে কাজী ইয়াকুবের মত আইনজ্ঞ পণ্ডিত কেউ ছিল না। তাঁরই বিধানমত খলিফার বিশাল সাম্রাজ্যের বড় বড় জটিল মামলা-মোকদ্দমা সব নিষ্পত্তি হ'ত। আইন সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হলেই খলিফা কাজী ইয়াকুবকে ডেকে পাঠাতেন।

কাজী সাহেব যথাসময়ে প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে খলিফাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। খলিফা তাঁকে নিয়ে আহারে বসলেন। খলিফার প্রাসাদে ভোজ—কত রকম খাবার যে এল, তার বর্ণনা করা যায় না। পরম তৃপ্তির সঙ্গে কাজী সাহেব সে সব খেলেন। সবের শেষে এল পেস্তার তৈরী পায়েস। তার মধুর গন্ধে কাজী সাহেবের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। খলিফাকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন—"হে সম্মানিত খলিফা, এ জিনিস তো পূর্ব্বে কখনও খাই নি। এর কি নাম?"

খলিফা বললেন—"এ হচ্ছে পেস্তার পায়েস। অনেক রকম দুষ্প্রাপ্য সুস্বাদু উপকরণ দিয়ে এ জিনিস তৈয়ের করা হয়। আমার প্রাসাদেই এ জিনিস হয়। বাইরের কোন বাবুর্চি

তৈয়ের করতে পারে না। প্রাসাদের বাবুর্চিরাও সব সময় এ জিনিস যথোচিতভাবে তৈয়ের করতে পারে না। আজ দেখছি ঠিক যেমন হওয়া উচিত তেমনি হয়েছে। কি সুন্দর

গন্ধ, আর কি সুন্দর দেখতে! একটু খেয়ে দেখুন। আপনার খুব পছন্দ হবে নিশ্চয়।"

খলিফার কথা শুনে, কাজী সাহেবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। তিনি ক্ষণেকের তরে অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবতে লাগলেন।

খলিফা বললেন—"কাজী সাহেব, আপনি হাসলেন কেন আর অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছেন?"

কাজী সাহেব বললেন—"পেস্তার পায়েসের কথা শুনে অতীত জীবনের কথা মনে পড়ল। তাই হাসছিলুম আর ভাবছিলুম।"

খলিফা বললেন—"কি কথা? আমায় বলুন, আমার শোনবার জন্য আগ্রহ হয়েছে।"

কাজী বললেন—"শুনুন তবে, শোনবার মত কথা বটে। আমার বয়স যখন খুব কম, তখন আমার পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি আমার জন্য আর আমার মায়ের জন্য কিছুই রেখে যান নি। মা সূতো কেটে সামান্য উপায় করতেন। তাতে আমাদের সংসার চলত না। আমাকে বাধ্য হয়ে এক রংরেজের কাছে চাকুরি নিতে হ'ল। কাপড়ে রং দেওয়া ছিল আমার কাজ। সামান্য যা মজুরি পেতুম, তাতেই আমাদের সংসার কষ্টে সৃষ্টে চলত।

"আমাদের পাড়ায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারবিদ্ মহাপণ্ডিত

থাকতেন। ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয় তিনি প্রত্যহ বক্তৃতা দিতেন। যার ইচ্ছে সে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পারত। তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। কৌতূহল পরবশ হয়ে আমি একদিন তাঁর বক্তৃতা শুনতে গেলুম। আমার সে বক্তৃতা এত ভাল লাগল যে, রোজই আমি সেখানে যেতে আরম্ভ করলুম। ক্রমে আমি মহাপণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। তিনি কাছে ডেকে আমাকে আমার নাম, পরিচয় প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আমার আসবার কথা সব তাঁকে খুলে বললুম। সস্নেহে আমার মুখে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'ইয়াকুব, তোমার প্রতিভা আছে। আমার বক্তৃতা নিয়মিত ভাবে শুনে যেয়ো, তোমার কাজে আসবে।' আমি নিয়মিত ভাবেই তাঁর কাছে যেতে লাগলুম। কোন বিষয় বুঝতে না পারলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতুম। তিনি যত্নের সঙ্গে আমায় বুঝিয়ে দিতেন।

"ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোচনায় তন্ময় হওয়ার দরুণ কাজের প্রতি আমার অবহেলা প্রকাশ পেতে লাগল। আমি নিয়মিত ভাবে রংরেজের দোকানে কাপড় রং দিতে যেতুম না। প্রায়ই কাজ কামাই করতুম। মা ভাবলেন, আমি পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে খেলিয়ে বেড়াই। তিনি বিরক্ত হলেন, আমাকে ভৎর্সনা করলেন। কোন ফল হ'ল না। আমি কোথায় যাই জানবার উদ্দেশ্যে, একদিন

তিনি আমার পিছু নিলেন। ব্যবহার-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতের বক্তৃতা-সভায় আমাকে যেতে দেখে তিনিও সেখানে প্রবেশ করলেন। আর আমাকে ব'সে বক্তৃতা শুনতে দেখে তিনি

পণ্ডিতের উপর বিষম চটে গেলেন, এবং তাঁর কাছে গিয়ে ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললেন,—'বুড়ো তোমার দাড়ি সব সাদা হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার বুদ্ধি এখনও পাকে নি। বাজে

কথা ব'লে তুমি গরীবদের সময় নষ্ট করছ। অপরের বিষয় যা ইচ্ছা কর, আমার কিছু বলবার নেই। তবে খোদার দোহাই, আমার ছেলের মাথাটা খেয়ো না। রংরেজের কাজ করলে সে দিনে দু আনা উপায় করত। তোমার বক্তৃতা শুনে কি লাভ তার হবে?'

"বিজ্ঞ হেকিম হেসে বললেন, 'বিধবা অত উত্তেজিত হয়ো না। তোমার ছেলেকে আমি ভালমত চিনেছি। সে রংরেজের দোকানে মজুরি করবার জন্য জন্মে নি। আমার শিক্ষার ফলে, দেখবে একদিন সে পেস্তার পায়েস খাবে।'

"মা চীৎকার ক'রে বললেন—'বুড়ো, আমি দেখছি তুমি বদ্ধ পাগল। আমার ছেলেকেও তুমি পাগল ক'রে ছাড়বে। আমার ছেলের কপালে শুকনো রুটিই জোটে না, ও খাবে পেস্তার পায়েস!'

"হেকিম বললেন, 'দেখতেই পাবে।'

"হেকিমের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার যেন জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেল। ব্যবহার-শাস্ত্রের সমস্ত জটিল সূত্রগুলো আমার মুঠোর মধ্যে এসে গেল। একদিন হেকিম বললেন, 'ইয়াকুব, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন তুমি মানুষকে ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয় শিক্ষা দেবার এবং ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয় বিধান দেবার অধিকার অর্জ্জন করেছ। তুমি একজন মস্ত লোক হবে। কালে তোমার যশ আর গৌরব দেশময় ছড়িয়ে পড়বে।'

"ওস্তাদের পদধূলি নিয়ে আমি স্বাধীনভাবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলুম। আমার খ্যাতি সহরময় ছড়িয়ে পড়ল। রাজদরবারে আমি কাজীর পদ পেলুম। তারপর ধীরে ধীরে উন্নতি করতে করতে প্রধান কাজীর পদে অধিষ্ঠিত হলুম। আজ আপনার এখানে এই পেস্তার পায়েস দেখে আমার ওস্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী আমার মনে পড়ল।"

খলিফা বললেন—"চমৎকার কাহিনী! দেখ ইয়াকুব, যে একাগ্রমনে সাধনা করে, যত নীচ বংশেই তার জন্ম হোক না কেন, আর যত বাধাই তার পথে থাকুক না কেন, সবকে ঠেলে সে সার্থকতার শীর্ষস্থানে গিয়ে পৌছায়। আমি শিক্ষা-মন্ত্রীকে আদেশ দেব, তোমার জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে যেন রাজ্যের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। গরীবের ছেলেরা দেখুক, ঐকান্তিক সাধনার ফলে মানুষ কি থেকে কি হতে পারে!"

কবির আমানত

ইমারুল কায়েস হচ্ছেন আরবী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আরবদেশের বড় বড় শেখসর্দ্দারদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্ব ছিল। শামুয়েল বিন আদী নামক এক আরব-সর্দ্দার তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কবি তাঁর বর্ম্ম এবং অস্ত্র-শস্ত্র শামুয়েলের কাছে আমানত রেখে নির্দ্দেশ দিয়ে যান, এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত হলে, শামুয়েল আমানতের মাল যেন তার হস্তে সমর্পণ করেন।

কিন্দর বাদশা এই আমানতের মাল শামুয়েলের কাছ থেকে চেয়ে পাঠালেন। শামুয়েল জানতে চাইলেন, কবির

মালে বাদশার কি অধিকার আছে। বাদশা বললেন, তাঁর যথেষ্ট লোক-লস্কর আছে, সুতরাং এ মাল তাঁকে দিতেই হবে।

শামুয়েল উত্তর পাঠালেন, প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছাড়া আর কাউকে তিনি কবির সম্পত্তি দেবেন না। তিনি কবিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে তিনি পারেন না। আরব শেখ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

শামুয়েলের অবাধ্যতায় বাদশা চটে আগুন হলেন, আর অবিলম্বে লোক-লস্কর নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন।

অভিযানের সংবাদ পেয়ে শামুয়েল তাঁর কেল্লার সব ফটক বন্ধ ক'রে দিলেন।

বাদশাও ছিলেন নাছোড়-বান্দা। তিনি কেল্লা অবরোধ ক'রে বসলেন।

শামুয়েলের পুত্র কেল্লার বাইরে ছিলেন। বাদশা তাঁকে বন্দী করলেন। তারপর বাদশা কেল্লার নিকটে গিয়ে শামুয়েলকে আহ্বান করলেন। শামুয়েল কেল্লার প্রাকারে উঠে বাদশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি তাঁকে ডাকছেন।

বাদশা শামুয়েলের পুত্রকে দেখিয়ে বললেন—"একে চেন?"

শামুয়েল বললেন—"চিনি বৈ কি! এ আমার পুত্র।"

বাদশা শামুয়েলের পুত্রকে দেখিয়ে বলিলেন—"একে চেন ?

বাদশা বললেন—"শোন শামুয়েল, বাড়াবাড়ি ছাড়, আমার কথা কান দিয়ে শোন। তোমার পুত্র আমার হাতে বন্দী। তুমি যদি ইমারুল কায়েসের বর্ম্ম এবং অন্যান্য সম্পত্তি স্বেচ্ছায় আমাকে দাও তাহলে তোমার পুত্রকে ফিরিয়ে দেব, আর অবরোধ তুলে, এখান থেকে চ'লে যাব। আর তোমাকে শেষবারের মত সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার কথামত তুমি যদি কাজ না কর, তাহলে তোমার এই পুত্রকে তোমার সামনেই আমি হত্যা করব। শুনলে তো? এখন যা ভাল বোঝ তাই কর।"

দুর্গ-প্রাকার থেকে অবিচলিত কণ্ঠে শামুয়েল উত্তর দিলেন —"প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

নির্ম্মম বাদশা শামুয়েলের পুত্রকে তাঁর চোখের সামনে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। এ দৃশ্য দেখেও কিন্তু শামুয়েলের বীর হৃদয় বিচলিত হ'ল না।

অনেক দিন ধ'রে বাদশা দুর্গ অবরোধ ক'রে রইলেন; কিন্তু কোন ফল হ'ল না। বেঁচে থাকতে আত্মসমর্পণ করবেন না, আর আমানতের মাল অনধিকারীকে দেবেন না—এই ছিল শামুয়েলের পণ।

স্বেচ্ছাচারী বাদশা আর ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে অবরোধ উঠিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর কবির প্রকৃত উত্তরাধিকারী শামুয়েলের কাছে উপস্থিত হলেন। আমানতের মাল শামুয়েল সানন্দে তাঁর হাতে অর্পণ করলেন।

সেই থেকে শামুয়েলের নাম আরবের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হয়ে আসছে। আমানতের মাল কি ক'রে রক্ষা করতে হয়, তিনি তার অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ভেজি খাদ্য তালিকা

খোরাসানের বাদশা বেদার বখ্‌তের তিন কন্যা—নজমা, জোহরা আর সাইয়ারা। তাঁদের বয়স যথাক্রমে আঠার, ষোল ও চৌদ্দ বৎসর। বাদশা বিপত্নীক ছিলেন। পুত্র-সন্তান কেউ ছিল না। কন্যারা যে পরম আদর এবং যত্নের সঙ্গে পালিতা হতেন সে-কথা বলাই বাহুল্য। মানুষ বুড়ো হলে তার মাথায় নানা রকম খেয়াল চাপে। বাদশা বেদার বখ্‌তের বেলাতেও এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড় খোশামোদপ্রিয় হয়ে উঠলেন। লোকের মুখে নিজের অত্যধিক প্রশংসা শুনতে তিনি বড় ভালবাসতেন।

একদিন কন্যাদের মুখে নিজের প্রশংসা শোনবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। শাহজাদীদের ডাক পড়ল। তাঁরা সকলে বাদশার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশা তাঁদের বসতে বললেন; তারপর প্রথমা কন্যাকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"বল দেখি মা! কে তোমায় প্রতিপালন করেন, কে তোমার রুজি যোগান?"

নজমা বললেন—"বাবা, আপনি ছাড়া কে আমার প্রতিপালন করবে—আপনি ছাড়া কে আমার রুজি যোগাবে? আপনি রাখেন ব'লে আমি থাকি, আপনি রুজি দেন ব'লে আমি খাই। আপনিই আমার রক্ষক আর পালক।"

বাদশা খুশী হয়ে বললেন—"ঠিক কথা বলেছ মা, বস তুমি।"

বাদশা তার পর দ্বিতীয়া কন্যা জোহরাকে সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। জোহরা উত্তর দিলেন—"বাবাজান, আপনি ছাড়া কে আমার প্রতিপালন করবে? আপনি ছাড়া কে আমার রুজি যোগাবে? আপনি রাখেন ব'লে আমি থাকি। আপনি রুজি দেন ব'লে আমি খাই। আপনিই আমার রক্ষক আর পালক।"

বাদশা খুশী হয়ে বললেন—"ঠিক কথা বলেছ মা, বস তুমি।"

কনিষ্ঠা কন্যা সাইয়ারা ছিলেন সবচেয়ে সুন্দরী আর সবচেয়ে বুদ্ধিমতী। বাদশা তাঁকে ডেকে বললেন—"বল দেখি মা সাইয়ারা, কে তোমায় রক্ষা করেন আর কে তোমায় রুজি দেন?"

গম্ভীরমুখে সাইয়ারা বললেন—"বাবাজান, বড় দুঃখ হচ্ছে, আমার দুই বড় বোনের কথায় আমি সায় দিতে পারলাম না। খোদা আপনাকে পালন করবার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা দিয়েছেন ব'লেই আপনি আমাদের পালন করেন। খোদা আপনাকে

রক্ষা করবার ক্ষমতা দিয়েছেন ব'লেই আপনি আমাদের রক্ষা

করেন। সুতরাং আমাদের প্রকৃত পালক এবং রক্ষক হচ্ছেন খোদা। খোদাই হচ্ছেন আমাদের রুজি দেনেওয়ালা।"

ক্রোধে বৃদ্ধ বাদশার ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল। পরুষকণ্ঠে সাইয়ারাকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন—"আমি তাহলে তোমার পালক নই ?"

সাইয়ারা নম্রকণ্ঠে বললেন—"খোদা ছাড়া পালক হবার ক্ষমতা কারও নেই, তিনিই আমার পালক।"

বাদশা বললেন—"আচ্ছা দেখা যাবে, খোদা কেমন ক'রে তোমায় পালন করেন। আজ থেকে আমি তোমায় নির্ব্বাসনে পাঠাচ্ছি।"

সাইয়ারা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—"সে আপনার মর্জি।"

বাদশার হুকুমে পাল্কি-বাহকেরা সাইয়ারাকে গহন জঙ্গলে ছেড়ে এল। কেবল একদিনের আহার্য্য তাকে দিয়ে এল তা'রা। রাজা-বাদশাদের ক্রোধ এমনিই হয়ে থাকে।

এক গাছের তলায় ব'সে বিষণ্ণমনে সাইয়ারা তাঁর ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলেন। বাবাকে অর্থাৎ বাদশাকে তিনি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন, অথচ অকারণে তিনি তাঁর ওপর নিদয় হয়ে তাঁকে সেখানে পাঠালেন। তাঁর দোষ—তিনি বাবার সন্তুষ্টির জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারেন নি! কিন্তু মিথ্যা কথা যে কারও সন্তুষ্টির জন্য বলা যায় না—মিথ্যা বলা যে মহাপাপ। কি ক'রে তিনি সে পাপ করতে পারেন ? তারপর তিনি তাঁর বর্ত্তমান বিপদের কথা ভাবতে লাগলেন।

শ্বাপদ-সঙ্কুল এই ভীষণ অরণ্যে তাঁর থাকবার কোন স্থান নেই, এক দিনের ছাড়া আহার নেই, বিপদে সাহায্য করবার কেউ নেই ; তা ছাড়া, এ স্থান একেবারে জনমানবশূন্য—মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, মানুষের কণ্ঠ-স্বর কোথাও শুনতে পাওয়া যায় না।

নিজের অসহায়তার কথা ভেবে সাইয়ারা অজস্রধারে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। হঠাৎ খোদার কথা তাঁর মনে পড়ল। আর কেউ থাক আর না থাক, খোদা তো আছেন। আর কেউ দেখুক আর না দেখুক, খোদা তো দেখেন। আর কেউ সাহায্য করুক আর না করুক, খোদা তো করবেন। আর কেউ বাঁচাক আর না বাঁচাক, খোদা তো বাঁচাবেন। সাইয়ারা তখন নিমীলিত চক্ষে অসহায়ের সহায়, আশ্রয়হীনের আশ্রয়, বন্ধুহীনের বন্ধু খোদাকে ডাকতে লাগলেন। এই বিষম বিপদে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আর এই বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে কাতরকণ্ঠে খোদাকে তাঁর অন্তরের মিনতি জানালেন।

হঠাৎ তাঁর অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কে যেন তাঁকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"ভাবনা কি সাইয়ারা! খোদাই একমাত্র বন্ধু! তিনিই তোমাকে সাহায্য করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাক তুমি।" প্রশান্তমনে সাইয়ারা চোখ মেলে চাইলেন।

সবিস্ময়ে সাইয়ারা দেখলেন, দিব্যকান্তি এক বৃদ্ধ দরবেশ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। দরবেশের মুখমণ্ডল স্বর্গীয়

আভায় উজ্জ্বল। প্রশান্তকণ্ঠে সাইয়ারাকে সম্বোধন ক'রে

দরবেশ বললেন—"কে তুমি মা? তোমাকে দেখে স্পষ্টই আমি বুঝতে পারছি, উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার জন্ম। এখানে তুমি কি ক'রে এলে আর কি উদ্দেশ্যেই বা এলে? তোমার কথা শোনবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে। আমায় নির্ভয়ে সব কথা বলতে পার। আমি সংসারত্যাগী দরবেশ। খোদার চিন্তা আর আরাধনাতেই জীবন কাটাই। অন্য কোন বাসনা কিংবা কামনা আমার নেই।"

সাইয়ারা বললেন—"বাবা, আপনি যে সংসার-বিরাগী দরবেশ, আপনার জ্যোতির্ম্ময় চেহারা দেখে স্পষ্টই তা বুঝতে পেরেছি। আপনাকে দেখেই আমার মন আশ্বস্ত হয়েছে। আপনার কাছ থেকে যে যথেষ্ট উপকার পাব আমার অন্তরই আমাকে তা ব'লে দিচ্ছে। আমি খোদার কাছে সাহায্য চাইছিলুম, তাই তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে আমার কাহিনী শোনাতে কোন আপত্তি নেই।"

তারপর সাইয়ারা তাঁর জীবন-কাহিনী সমস্ত দরবেশকে বললেন।

বাবা মোস্তাফা সাইয়ারার কাহিনী শুনে চমৎকৃত হয়ে বললেন—"মা, তোমার খোদা-ভক্তি আর সাহস দেখে আমি সত্যই আশ্চর্য্য হলুম। নিশ্চয় তুমি জীবনে অশেষ গৌরবের অধিকারিণী হবে। আশ্রয় আর রুজির বিষয় তোমার চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন নেই। নিকটেই আমার আস্তানা।

সেখানে নির্ব্বিঘ্নে তুমি থাকতে পারবে। বহু শাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি তোমাকে ভাল রূপে শিক্ষা দিতে পারব। আর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা—তা সে খোদাই করবেন। আজ থেকে তুমি আমার কন্যার স্থান গ্রহণ কর। আমাকে তুমি তোমার পিতা ব'লেই জানবে।"

সাইয়ারা যে এই খোদা-প্রেরিত বন্ধু পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত হলেন সে-কথা বলাই বাহুল্য। দরবেশের সঙ্গে তিনি তাঁর আস্তানায় গেলেন, আর সেই দিন থেকে তাঁর নূতন জীবন সুরু হ'ল।

দরবেশের কুটীর ছিল সুন্দর এক উপত্যকায়। পাশ দিয়ে ক্ষুদ্র এক পার্ব্বত্য নদী বয়ে যাচ্ছিল। অদূরে অরণ্য-সমাকীর্ণ পর্ব্বত। আস্তানার চারদিকে সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। স্থানটি ছিল সত্যই অতি মনোরম। কত রকম সুন্দর সুন্দর সুকণ্ঠ পাখী সেখানে এসে গান করত। ময়ূর-ময়ূরীরা গৃহ-প্রাঙ্গণে এসে নাচত। হরিণ-শিশুরা দরবেশ আর সাইয়ারার হাত থেকে খাবার পাবার আশায় নিত্য সেখানে আসত।

অবিলম্বে হরিণ-শিশুদের সঙ্গে সাইয়ারার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তা'রা দু'বেলা এসে তাঁর সঙ্গে খেলা করত; আবার যখন খুশী অদৃশ্য হ'ত। সাইয়ারা তাদের কারও নাম দিয়েছিলেন রোস্তম, কারও নাম দিয়েছিলেন সোহরাব, কারও নাম দিয়েছিলেন জমসেদ; এই রকম প্রত্যেকেরই সুন্দর এক একটি

নাম দিয়েছিলেন। নাম ধ'রে ডাকলেই তা'রা দৌড়ে তাঁর কাছে আসত আর তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত, জিভ দিয়ে তাঁর হাত চাটত—বিভিন্ন উপায়ে তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা জানাত।

সকালে সাইয়ারা গৃহকর্ম্মাদি সেরে বাবা মোস্তাফার কাছে পাঠ নিতেন। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁকে নিয়মিত পাঠ দিতেন। বাবা মোস্তাফা খুব ভাল গজল গাইতে পারতেন, আর সেতার বাজাতে পারতেন। সন্ধ্যার পর তিনি সুফি কবিদের সুন্দর সুন্দর গজল সাইয়ারাকে গেয়ে শুনাতেন। সাইয়ারা ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন, খোদা-প্রেমে অন্তর তাঁর ভ'রে যেত।

এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই সাইয়ারার জীবন কাটত। একদিন সকালে সাইয়ারা পড়াশুনা শেষ ক'রে তাঁর হরিণ-শিশুদের ডাকলেন। সকলেই এল, কিন্তু রোস্তম নামক হরিণ-শিশুটি এল না। সাইয়ারা এদিক ওদিক তাকে খুঁজতে আর ডাকতে লাগলেন। হঠাৎ রোস্তম কোথা থেকে দৌড়ে এসে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল, আর কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করতে লাগল। তার গায়ে হাত বুলাতে গিয়ে সাইয়ারা দেখলেন তার উরুদেশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। শিকারীর এক তীর সেখানে প্রবেশ করেছে। রোস্তমের অবস্থা দেখে

সাইয়ারা করুণকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আর তার দেহ থেকে শিকারীর তীর বার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অনতিবিলম্বে সেখানে এক অশ্বারোহী সওয়ার এসে উপস্থিত হলেন আর মুগ্ধনয়নে এদৃশ্য দেখতে লাগলেন।

সওয়ার ভাবলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আমি অনেক সুন্দরী দেখেছি, কিন্তু রূপ এবং লাবণ্যের এমন নিখুঁত প্রতিমা তো কোথাও দেখি নি। স্বর্গের হুরও যে এর কাছে হার মানে। গহন বনে, এই পর্ণকুটীরে খোদার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি কোথা থেকে আবির্ভূতা হলেন!' হঠাৎ সাইয়ারা চোখ তুলে সওয়ারের দিকে চাইলেন। চার চক্ষুর মিলন হ'ল। সাইয়ারা মাথা হেঁট করলেন।

সওয়ার নম্রকণ্ঠে সাইয়ারাকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"ক্ষমা করবেন, আমি কি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

ইতিমধ্যে রোস্তম করুণ স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল। সাইয়ারা কাতরকণ্ঠে বললেন—"পরিচয় পরে নেবেন, আপাততঃ আমার রোস্তমকে বাঁচান।"

সওয়ারের তখন রোস্তমের দিকে দৃষ্টি পড়ল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন আর দক্ষ চিকিৎসকের মত শরটি রোস্তমের দেহ থেকে বার ক'রে সেখানে প্রলেপ মাখিয়ে দিলেন। প্রলেপ তাঁর সঙ্গেই ছিল। রোস্তম তখন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

ইতিমধ্যে বাবা মোস্তাফা সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি নিকটেই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সওয়ার তাঁকে দেখে একান্ত ভক্তির সঙ্গে সালাম করলেন, আর

অপ্রত্যাশিতভাবে বিনা অনুমতিতে তাঁর আলয়ে আসার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দরবেশ প্রত্যভিবাদন ক'রে তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেন, আর তাঁর জন্য একটি গালিচা বিছিয়ে দিলেন। তারপর অতিথির জন্য কিছু নাস্তার (জলযোগের) ব্যবস্থা করতে সাইয়ারাকে বললেন। সাইয়ারা প্রসন্নমনে জলযোগের ব্যবস্থা করতে চ'লে গেলেন।

দরবেশ তখন অতিথির কাছে ব'সে তাঁর পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করলেন। ইতিমধ্যে সওয়ারের দুইজন অশ্বারোহী অনুচরও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। দরবেশ আসন বিছিয়ে তাঁদেরও বসতে অনুরোধ করলেন ; তারপর সওয়ারের সঙ্গে বাক্যালাপে মশগুল হলেন। সওয়ার বললেন—"আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি মহাত্মা, উচ্চবংশীয় এক দরবেশ। আপনার কন্যাকে দেখেই বোঝা যায় তিনি রাজ-প্রাসাদে পালিতা। আপনাদের ইতিহাস ইচ্ছা হয় বলবেন, আর ইচ্ছা না হয় বলবার দরকার নেই। আমি হচ্ছি খিভা রাজ্যের সুলতান আহমদ মির্জ্জা। শিকারের জন্য এই জঙ্গলে এসেছিলুম। একটি হরিণ দেখে তার উদ্দেশ্যে শর নিক্ষেপ করেছিলুম। ঐ সেই হরিণ। ওরই অনুসরণ ক'রে আপনাদের আস্তানায় এসে উপস্থিত হয়েছি।"

দরবেশ বললেন—"সুলতান, আপনার সাক্ষাৎ লাভ ক'রে

সত্যই আমি আনন্দিত হলুম। আপনার যশ এবং খ্যাতি ইতিপূর্ব্বেই শুনেছি। আজ আপনাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলুম। আমার নাম বাবা মোস্তাফা। আমি সংসার ছেড়ে এই নির্জ্জন স্থানে খোদার ধ্যানেই মগ্ন থাকি। আমার মেয়ের নাম সাইয়ারা বেগম।

"এই মেয়ে প্রকৃতপক্ষে খোরাসানের বাদশা বেদার বখ্‌তের কন্যা। বৃদ্ধবয়সে পিতার মনে একটু অহমিকা এসে গেছে। একদিন তিনি সাইয়ারাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাকে প্রতিপালন করে, আর কে তার রুজি দেয়। সাইয়ারা বলে, খোদা তাকে প্রতিপালন করেন আর তিনিই তার রুজি দেন।···এই উত্তরে ক্রোধান্বিত হয়ে বৃদ্ধ বাদশা সাইয়ারাকে বনবাসে পাঠান। সে প্রায় দুই বৎসরের কথা। আমি সাইয়ারাকে একটি গাছের তলায় ব'সে থাকতে দেখে তাকে আমার আস্তানায় নিয়ে আসি। সেই থেকে সে আমার কন্যা-রূপেই আছে।"

সাইয়ারার পরিচয় পেয়ে সুলতান মনে মনে উৎফুল্ল হলেন আর দরবেশকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"দরবেশ বাবা, আপনার নাম এবং খ্যাতি আমি পূর্ব্বেই শুনেছিলুম। আজ আপনার সাক্ষাৎ লাভ ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাদশাজাদী সাইয়ারাকে দেখেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তাঁর পরিচয় পেয়ে আর তাঁর ইতিহাস শুনে সত্যই আমার মন

আনন্দে ভ'রে গেছে। তাঁর মত গুণবতী তরুণী পৃথিবীতে সত্যই দুর্লভ। আপনি যদি অনুমতি দেন আমি তাঁকে আনন্দে সুলতানারূপে বরণ করি।"

দরবেশ বললেন—"বাবা, আপনার মত জামাতা পাওয়া আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তবে সাইয়ারা এখন পরিণত বয়সে পৌঁছেছে। তার মতামত জিজ্ঞাসা করা দরকার।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সাইয়ারা অতিথির জন্য কিছু নাস্তা নিয়ে উপস্থিত হলেন। সুলতানের পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রস্তাবের কথা সানন্দে দরবেশ সাইয়ারাকে বললেন, আর তাঁর অভিমত চাইলেন। লজ্জাবনত শিরে সাইয়ারা বললেন—"আপনি যখন রাজি আছেন বাবা, তখন আমি আর কি বলি?"

সুলতান দরবেশকে বললেন—"আমি প্রাসাদে ফিরে গিয়েই আপনাদের জন্য উপযুক্ত যান-বাহনাদি পাঠাচ্ছি। শুভ বিবাহ প্রাসাদে সম্পন্ন হোক, এই আমার ইচ্ছা।"

দরবেশ এবং সাইয়ারা উভয়েই তাতে রাজি হলেন।

এখানে সুলতান আহমদ মির্জ্জার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সুলতানের বয়স ত্রিশ বৎসরের বেশী হবে না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। অতুলনীয় যোদ্ধা এবং প্রজারঞ্জক বাদশা হিসাবে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। তিনি

যুদ্ধে এবং রাজকার্য্যে এতই ব্যস্ত থাকতেন যে, বিবাহের বিষয় চিন্তা করবার অবসরও তাঁর হয় নি। প্রকৃত যোদ্ধার মত শিকার তিনি বড় ভালবাসতেন। রাজকার্য্য থেকে অবসর পেলেই তিনি শিকারে বের হতেন। এই শিকার উপলক্ষেই বাদশাজাদী সাইয়ারা এবং বাবা মোস্তাফার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত-ভাবে তাঁর সাক্ষাৎ হয়—একথা পূর্ব্বেই আমরা বলেছি।

যথাসময় রাজধানী থেকে বাবা মোস্তাফা এবং বাদশাজাদী সাইয়ারাকে নিয়ে যাবার জন্য উপযুক্ত যান-বাহনাদি এল আর সঙ্গে এল বিভিন্ন রকমের উপঢৌকন, বেশভূষা, মূল্যবান জহরত আর বিচিত্র বেশ পরিহিত একদল রক্ষী সেনা।

মহাসমারোহে সুলতানের সঙ্গে বাদশাজাদীর বিবাহ হয়ে গেল। দেশময় আনন্দ আর উৎসব। এক মাসের জন্য প্রজাদের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ হ'ল। দেশ-বিদেশ থেকে গায়ক, বাদক, বাজিকর প্রভৃতি এসে লোকের চিত্ত বিনোদন করতে লাগল। হাজার হাজার রকমের আতস-বাজি সমস্ত রাত্র ধ'রে এক ঐন্দ্রজালিক জগতের সৃষ্টি করতে লাগল। তোমরা সে সময় খিভা রাজ্যে থাকলে, নিশ্চয়ই সে আনন্দের অংশ নিতে পারতে!

সুলতান এবং সুলতানা পরম সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন। বাবা মোস্তাফা তাঁর কুটীরেই রইলেন, তবে সাইয়ারার মায়া তিনি কাটাতে পারেন নি—যদিও তিনি

সংসার-বিরাগী দরবেশ ছিলেন। প্রায়ই তিনি প্রাসাদে আসতেন আর জামাতা এবং কন্যার সঙ্গে দু'এক দিন আনন্দে কাটিয়ে যেতেন।

যথাসময় সুলতানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক পুত্র-রত্ন প্রসব করলেন। দরবেশের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সুলতান তাঁর নাম রাখলেন বদর-উল-মুল্‌ক—রাজ্যের পূর্ণচন্দ্র। প্রজারা তাঁকে "বদরু ভাই" ব'লে ডাকত। বদরু ভাই পরম আনন্দে তাদের সঙ্গে তাদের একান্ত আপনজনের মতই হেসে খেলে বেড়াতেন। এই ভাবে সাত-আট বৎসর আনন্দে কেটে গেল।

একদিন সুলতান আহমদ 'দিওয়ানে আমে' ব'সে রাজকার্য্য পরিচালন করছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ বোরখা-পরিহিতা দুই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। সুলতান বৃদ্ধকে দেখেই বুঝলেন, ইনি সাধারণ লোক নন। চেহারা, হাবভাব প্রভৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, সমস্ত জীবন তিনি লোকের ওপর আধিপত্যই ক'রেই এসেছেন। সুলতান বৃদ্ধকে নিকটে ডাকিয়ে তাঁর পরিচয় এবং দরবারে আসার উদ্দেশ্যের বিষয় প্রশ্ন করলেন। বৃদ্ধ বললেন, তাঁর বক্তব্য সুলতানের খাস কামরায় গিয়ে তিনি বলবেন। সুলতান বৃদ্ধকে বসতে ব'লে প্রয়োজনীয় রাজকার্য্য শেষ করলেন, তারপর খাস কামরায় গিয়ে বৃদ্ধকে ডেকে পাঠালেন।

বৃদ্ধ সঙ্গী মহিলাদের নিয়ে সুলতানের খাস কামরায় প্রবেশ করলেন। সুলতান তাঁদের বসতে অনুরোধ করলেন, তারপর বৃদ্ধকে তাঁর কাহিনী বলতে বললেন।

বৃদ্ধ বললেন—"হে মহামহিম সুলতান! এ বৃদ্ধও একদিন বিশাল এক রাজ্যের অধিকারী ছিল। একাদিক্রমে বৎসরের পর বৎসর ধ'রে সৌভাগ্যের আস্বাদ পেয়ে অন্তর আমার গর্ব্বে ফুলে উঠল। আমি একান্ত দাম্ভিক হয়ে উঠলুম। এ বিশ্ব যে খোদার রাজ্য, আর তিনিই যে আমাদের রুজি দেন এই সহজ সত্যটিও আমি ভুলে গেলুম। আমার তিন কন্যা নজমা, জোহরা আর সাইয়ারা। নজমা আর জোহরাকে আপনার সম্মুখেই দেখতে পাচ্ছেন। সাইয়ারা এখানে নেই।" সাইয়ারার কথা স্মরণ ক'রে বৃদ্ধ চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তারপর আত্মসম্বরণ ক'রে বললেন—"কি বলব সুলতান, রূপে, গুণে, চরিত্রে সাইয়ারার মত মেয়ে সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। মদগর্ব্বে যখন আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছিল. সেই সময় একদিন মেয়েদের ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে তাদের পালন করেন আর কে তাদের রক্ষা করেন। আমার এই দুই কন্যা, নজমা আর জোহরা বললে, আমিই তাদের পালন করি আর আমিই তাদের রক্ষা করি। তাদের কথা আমার অহমিকার আগুনে ইন্ধন যোগাল। আমি খুব খুশী হলুম। তারপর সাইয়ারাকে আমি সেই

একই প্রশ্ন করলুম। সাইয়ারা ছিল একান্তভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠ আর সত্যভাষিণী। সে নম্র অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'বাবা, খোদাই হচ্ছেন সকলের পালক, তিনি হচ্ছেন সকলের রুজি দেনেওয়ালা; আপনি উপলক্ষ্য মাত্র।' মদগর্ব্বে আমি তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছিলুম। এই অতি সত্য কথা বলার জন্য সাইয়ারার প্রতি আমি একান্ত নির্ম্মম ব্যবহার করলুম—তাকে নির্ব্বাসনে পাঠালুম। সুলতান, যেদিন থেকে এই অস্বাভাবিক পাপ আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেইদিন থেকে একদিনও আমি আরামে কাটাতে পারি নি। অনুশোচনায় আমার অন্তর দগ্ধ হতে লাগল। আমি সাইয়ারার সন্ধানে লোক পাঠালুম, কিন্তু তার কোন খবর পেলুম না। খোদাই জানেন সে কোথায় আছে এবং কি অবস্থায় আছে। সে কি বেঁচে আছে না তার উপযুক্ত স্থান জেন্নাতে (স্বর্গে) চ'লে গেছে! সে কি নিরাপদে আছে না কোন হিংস্র শ্বাপদ তাকে ভক্ষণ করেছে? সে কি সম্মান এবং ইজ্জতের সঙ্গে আছে না দস্যু-তস্করের হাতে প'ড়ে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করছে!—এই সব চিন্তা আমাকে সর্ব্বক্ষণ অধীর ক'রে রাখত। মনের অশান্তির দরুণ আমি রাজকার্য্যে অবহেলা করতে লাগলুম। দেশময় অশান্তি এবং অরাজকতা এসে দেখা দিল। সুযোগ বুঝে দুর্ব্বৃত্ত মোঙ্গলেরা আমার রাজ্য আক্রমণ করল। ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। আমার ফৌজ সে যুদ্ধে ধ্বস্তবিধ্বস্ত হয়ে

গেল। আত্মরক্ষার জন্য আমি আমার কন্যাদের নিয়ে দেশত্যাগী হলুম। তারপর, আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। এখন আপনার করুণার উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।"

এই করুণ কাহিনী শুনেও সুলতান পরিহাসের প্রবৃত্তি দমন করতে পারলেন না। বাদশা বেদার বখ্‌তকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন—"হে খোরাসান-অধিপতি! আপনি আপনার কনিষ্ঠা কন্যা সাইয়ারার কথা ভুলে যাচ্ছেন—'খোদা আমাদের রক্ষা করেন। তিনিই আমাদের রুজি দেনেওয়ালা।' খোদাই আপনাদের রক্ষা করবেন; আমি উপলক্ষ্য মাত্র। তবে একথা আপনাদের বলছি, আপনাদের সাহায্য করতে আমি কিছুমাত্র কার্পণ্য করব না। দুর্ভাগ্যের অমানিশায় যখন সব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখনই সৌভাগ্য-রবির ক্ষীণ রশ্মিরেখা মানুষের ভাগ্যাকাশে এসে দেখা দেয়। আপনার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। আপনার স্নেহের কন্যা সাইয়ারাকে আপনি আবার ফিরে পাবেন। আর যদি খোদার ইচ্ছা হয়, তাহলে আপনার হৃত রাজ্যও আপনি ফিরে পাবেন।"

বাদশা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"হায় আল্লা, সে ভাগ্য কি এ বৃদ্ধের কখনও হবে! সাইয়ারাকে কি কখনও এ জীবনে আমি দেখতে পাব?"

সুলতান বললেন—"আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি

এখনই আসছি।" তিনি আন্দর-মহলে চ'লে গেলেন। বেদার বখ্‌ত কন্যাদের সঙ্গে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বাদশাজাদা বেদর-উল-মুল্‌কের বয়স মাত্র সাত বৎসর। এই বয়সেই তিনি যুদ্ধ-বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তাঁর মত তীরের সাহায্যে লক্ষ্য ভেদ করতে অতি অল্প লোকই পারত। অন্দর-মহলে তিনি নিজের কৃতিত্ব সগর্বে তাঁর মাকে দেখাচ্ছিলেন। মাটির একটি চড়ুই পাখী পঞ্চাশ হাত দূরে রেখে তার চক্ষুকে লক্ষ্য ক'রে তিনি তীর নিক্ষেপ করলেন। তীর পাখীর চক্ষু ভেদ ক'রে চ'লে গেল। বাদশাজাদা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নাচতে লাগলেন। সুলতানা সাইয়ারা পুত্রের কৃতিত্ব দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—"বদরু, তুমি তোমার পিতার মতই অজেয় যোদ্ধা হবে।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সুলতান সেখানে প্রবেশ করলেন। সাইয়ারা তাঁকে বদরুর কৃতিত্বের কথা বলতে যাচ্ছিলেন, সুলতান বাধা দিয়ে বললেন—"যা স্বপ্নেও কখনও ভাব নি তাই হয়েছে।"

সাইয়ারা বললেন—"কি এমন হয়েছে, যা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি! খুলে বলুন।"

সুলতান বললেন—"এখন খুলে বলা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

সবিস্ময়ে সাইয়ারা স্বামীর অনুসরণ করলেন।

পিতা কন্যার সাক্ষাৎ—সে কি চমকের ব্যাপার! পিতাকে দেখেই সাইয়ারা আনন্দে "বাবা কখন এলেন" ব'লে চীৎকার

ক'রে উঠলেন। তারপর বেদার বখ্‌তের মলিন বেশভূষা দেখে আত্মসম্বরণ ক'রে বললেন—"কি হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

বৃদ্ধ বেদার বখ্‌ত এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর হারানিধিকে পেয়ে স্নেহের আতিশয্যে তাঁকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন আর সাইয়ারার মস্তক চুম্বন করতে করতে অঝোর ধারে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। আনন্দের উচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হলে পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা তাঁরা পরস্পরকে শুনালেন। বেদার বখ্‌ত বললেন—"মা, তোমাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে রাজ্য হারাবার শোক আমি ভুলে গিয়েছি। খোদাকে ধন্যবাদ তিনি আমার মনের শান্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের আমার আর দরকার নেই। তোমার সঙ্গে জীবনের শেষ ক'দিন কাটাতে পারলেই আমি সুখী হব।"

সুলতান আহমদ মির্জ্জা বললেন—"খোদার যদি ইচ্ছা হয়, আপনার রাজ্য নিশ্চয় আপনি ফিরে পাবেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

বালক বদর-উল-মুল্‌ক বাপমায়ের পিছনে পিছনে এসে এ দৃশ্য দেখছিলেন। তিনিও পিতার সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"আপনার রাজ্য নিশ্চয় আপনি ফিরে পাবেন।"

যুদ্ধ ছিল সুলতান আহমদের ব্যবসা। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। দু'দিন যেতে না যেতেই রাজ্যময় "সাজ সাজ" রব উঠল। সুলতানের হুকুমে দলে দলে প্রজারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজধানীতে জড় হতে লাগল।

কোমরে তরওয়াল বেঁধে, তীরদানে তীর আর বুকের ওপর ধনুক ঝুলিয়ে, হাতে বর্শা নিয়ে, ছোট্ট একটি ঘোড়ায় চ'ড়ে বাদশাজাদা বদর-উল-মুল্‌ক খাওয়া দাওয়া ছেড়ে সৈনিকদের মধ্যে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলেন আর যুদ্ধের জন্য সকলকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। সৈনিকেরা বলতে লাগলেন "জরুর ফতেহ্ হোগা—বদরু ভাইয়াকা ওয়াস্তে হাম লোক জান দে দেবো (নিশ্চয় যুদ্ধে জয়লাভ হবে, বদরু ভাইয়ের জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন দেব)।"

অনতিবিলম্বে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে সুলতান আহমদ মির্জ্জা খোরাসান রাজ্যের উদ্দেশ্যে অভিযান করলেন। রাজধানীর উপকণ্ঠে যে বিশাল প্রান্তর, সেখানে মোঙ্গল বাহিনীর সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হ'ল। মোঙ্গলেরা সাহসে কম ছিল না, আর সংখ্যায় তা'রা বেশীই ছিল। সুলতানের যুদ্ধ-কৌশল কিন্তু ছিল অতুলনীয়। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে নানা দিক থেকে আক্রমণ ক'রে মোঙ্গলদের অতিষ্ঠ ক'রে তুললেন। বাদশাজাদা বদর-উল-মুল্‌ক তাঁর বিশ্বাসী ঘোড়ায় চ'ড়ে নির্ভীক প্রাণে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে বেড়াতে লাগলেন আর সৈনিকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। সৈনিকেরা তাঁকে দেখে জয়ধ্বনি করতে লাগল—"জয়, বদরু ভাইয়া কি জয়" আর প্রাণপাত ক'রে লড়তে লাগল।

যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ দুই বাহিনীর প্রধান পরিচালকদের

অর্থাৎ সুলতান আহমদ মির্জ্জা এবং মোঙ্গল বাহিনীর নেতা উলঘুবেগের সাক্ষাৎ হ'ল। দু'জনই অমিতপরাক্রম যোদ্ধা, দু'জনই অস্ত্র পরিচালনায় সমান দক্ষ, দু'জনই যুদ্ধজয়ের জন্য জীবন পণ ক'রে এসেছিলেন। দু'জনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। সে সত্যই দেখবার মত এক যুদ্ধ। কত রকম পেঁচ, কত রকম কৌশল, অস্ত্র চালনার কত রকম নিপুণতা যে এই দুই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা দেখাতে লাগলেন, ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। কেউ কিন্তু কাউকে পরাস্ত করতে পারলেন না। ঠিক এই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে বাদশাজাদা বদর-উল-মুল্‌ক ঘোড়া চালিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন আর পিতার বিপদ দেখে, কালবিলম্ব না ক'রে মোঙ্গল-সর্দ্দারের চক্ষু লক্ষ্য ক'রে তীর ছুড়লেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। তীরটি সোজা মোঙ্গল-সর্দ্দারের চক্ষু ভেদ ক'রে গেল। তিনি অশ্ব থেকে প'ড়ে গেলেন। আহমদ মির্জ্জা তৎক্ষণাৎ তরবারীর সাহায্যে তাঁর মস্তক ছেদন করলেন। সুলতানের বাহিনীর সৈনিকেরা ভীমরবে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। মোঙ্গলেরা তাদের নেতাকে হারিয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পলায়নপর হ'ল। সুলতানের ফৌজ তখন চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ভীষণ ধ্বংস-লীলার সৃষ্টি করল। অতি অল্প সংখ্যক মোঙ্গলই পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারল—অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। মোঙ্গল বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

বিজয়ী সুলতান আহমদ মির্জ্জা সগৌরবে খোরাসানের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন এবং বাদশা বেদার বখ্‌তের নামে রাজ্য অধিকার করলেন। যথাসময় বাদশা বেদার বখ্‌ত, সুলতানা সাইয়ারা প্রভৃতি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিরাট এক দরবার হ'ল। বাদশা বেদার বখ্‌ত সেই সভায় সিংহাসনে বসলেন, আর তাঁর ডান দিকে বসলেন বিজয়ী বীর সুলতান আহমদ মির্জ্জা। বাদশার বামদিকে বসলেন সুলতানা সাইয়ারা। আর তাঁর পাশে তাঁর বোনেরা বসলেন। সুলতান আহমদ মির্জ্জার পাশে বসলেন শাহজাদা বদর-উল-মুল্‌ক। রাজ্যের সর্দ্দারেরা বাদশাকে তাঁদের অন্তরের অভিনন্দন জানালেন।

বাদশা সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"বন্ধুগণ! আমি যে হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছি তার জন্য খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার কন্যা সুলতানা সাইয়ারার সৌভাগ্য আর তাঁর স্বামী, যুগের শ্রেষ্ঠ বীর সুলতান আহমদ মির্জ্জার কর্ম্মতৎপরতার ফলেই এ সাফল্য আমি লাভ করেছি। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। রাজ্য-পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করবার ইচ্ছা আমার নেই, সে-সামর্থ্যও এখন আর আমার নেই। আমার স্থানে আমার দৌহিত্র বাদশাজাদা বদর-উল-মুল্‌ককে আমি খোরাসান রাজ্যের বাদশারূপে ঘোষণা করলুম। তিনি যতদিন নাবালক থাকবেন, ততদিন তাঁর

পিতা সুলতান আহমদ মির্জ্জা, তাঁর অভিভাবকরূপে রাজত্ব চালাবেন। দেশের সর্দ্দারগণ এবং আমার ভক্ত প্রজাপুঞ্জ! আপনারা সকলে নূতন বাদশার শাসনে সুখ এবং সমৃদ্ধি লাভ করুন, এই হবে আমার প্রত্যেক জীবিত দিনের প্রার্থনা।"

সমবেত জনতার হর্ষধ্বনিতে সভামণ্ডপ মুখরিত হয়ে উঠল। বেদার বখ্‌তের আদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অভ্রচুম্বী শ্বেত-মর্ম্মরের এক মিনার নির্ম্মিত হ'ল। আর সেই মিনারে সুলতানা সাইয়ারার কথা—"আমাদের রক্ষক এবং পালক হচ্ছেন খোদা! তিনিই রুজি দেনেওয়ালা"—সুবর্ণ অক্ষরে উৎকীর্ণ করা হ'ল। এই মিনার এখনও "সুরাইয়া মিনার" নামে খ্যাত।